বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু

- শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

পেশায় শিক্ষক। সবাই তাঁকে 'বড়দা' বলেই ডাকতাম, আসল নামে পরে আসা যাবে। 'বাঙ্গাল' মানুষ, বাংলা উচ্চারণে পূর্ববঙ্গীয় টান সুস্পষ্ট। বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই, আমাদের চেয়ে অনেকটাই বড়। উনিশ শ' ষাট-সত্তরের দশকে দক্ষিণ লন্ডনের ব্রিক্সটন হয়ে ওঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে আসা কালো মানুষের পাড়া। দু-চার ঘর সাদা মানুষ যে ছিল না তা নয়, তবে তারা সংখ্যায় নগণ্য। সাদায়-কালোয় মিলেমিশে এক নতুন ইংল্যান্ড তখন তৈরি হচ্ছে বলা যায়। ব্রিক্সটনের কাছাকাছি পাড়াগুলিতে বাঙ্গালী সমেত অনেক ভারতীয় পরিবারের বাসস্থান ছিল। বিলেতের ছাত্রজীবনে আমারও মাথা গোঁজার জায়গা কিছুদিন এই সব অঞ্চলেই ছিল।

বড়দা থাকতেন ক্ল্যাপহ্যামে, আর পড়াতেন মাইল-দুয়েক দূরে ব্রিক্সটনের একটি স্কুলে। প্রধানত ইতিহাস পড়াতেন তিনি, যদিও প্রয়োজনমত ইংরেজি এবং সমাজবিদ্যাও তাঁকে পড়াতে হত। স্কুলের ছাত্রদের বেশীর ভাগই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ এবং তাদের বাবা-মায়েরা প্রায় সবাই নিম্ন-মধ্যবিত্ত, খেটে-খাওয়া মানুষ। কিন্তু তাঁরা সকলেই চাইতেন ছেলে-মেয়েরা যেন লেখা- পড়া শিখে তাঁদের থেকে উচ্চতর পেশায় যেতে পারে। তাই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে উদ্বেগ থাকত তাঁদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সাহেবদের দেশে জন্মানো ছেলে-মেয়েরা বাবা-মায়ের এইসব উদ্বেগের ধার খুব একটা ধারত না।

বেশ বড়সড়, নাদুসনুদুস চেহারার বড়দা গোঁফ রাখতেন, তাই সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন ভারিক্কি মানুষ। অকৃতদার বড়দা থাকতেন ভাড়া বাড়ির একটি ঘরে, যৎসামান্য আসবাবপত্র নিয়ে। একটি ছোট ফোক্স-ওয়াগন গাড়ি ছিল তাঁর বাহন। স্কুল শেষ করে বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বড়দা কোন-না-কোন পরিচিত বাঙ্গালী পরিবারে চলে যেতেন সময় কাটাতে। আড্ডার সঙ্গে চা-বিস্কুট চলত, কখনও বিয়ার-টিয়ারও এবং প্রায়শই রাতের খাবার। আর একটি অভ্যাস ছিল বড়দার - পাড়ার পানশালায়, অর্থাৎ পাবে, শুক্র-শনিবারে ঢুঁ মারা।

বিলেতের সমাজজীবনে 'পাব' একটি অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। Pub শব্দটি এসেছে public house থেকে, অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। পাড়ায় পাড়ায় এই পাবগুলিতে স্থানীয় বাসিন্দারা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে সন্ধ্যার পর নিয়মিত হাজির হ'ন। পাবের মালিক বা কর্মচারীরা তাঁদের নিয়মিত খদ্দেরদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত হয়ে পড়েন এবং কোন্ খদ্দের কি পানীয় পছন্দ করেন মনে রাখেন। খদ্দের পানীয় কিনতে গেলে মালিক মৃদু হেসে বলবেন "Usual?", অর্থাৎ "তুমি রোজ যেটা খাও সেটাই তো"? মাতাল হতে নয়, মানুষ আড্ডার টানেই পাবে গিয়ে থাকেন, পানীয়টা উপলক্ষ্য।

বড়দাও তাঁর পাড়ার বিশেষ একটি পাবেরই নিয়মিত খদ্দের ছিলেন। এই পাবটির মালিক সাদা হলেও খদ্দেরদের বেশীর ভাগই ছিল অ-শ্বেতকায়, ভারতীয় বা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান। পাবটির নাম ছিল "The King George III"। কিন্তু খদ্দেরদের আদরের নাম ছিল "The Mad King"। আমরা অনেক সময় বলতাম 'চল্, আজ পাগলা রাজার অতিথি হওয়া যাক্'।

বড়দা একদিন আমাকে তাঁর পাবের এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যিনি ত্রিনিদাদের মানুষ এবং পেশায় লন্ডনের বাস-কন্ডাক্টার। নাম তাঁর সিরিল, পদবী ক্লাইভ। তিনি বড়দাকে সম্বোধন করলেন "মিঃ গশ" ব'লে। বড়দার পদবী ছিল ঘোষ। ইংরেজি উচ্চরণে 'ঘ' হয়ে যায় 'গ' এবং 'Ghosh' শব্দের মাঝের 'O' টির উচ্চারণ হয় 'অ' এর মত। তাই বড়দা হয়ে গেলেন "মিঃ গশ"। বড়দা আমাকে বাংলায় বলে দিলেন "অনেক চ্যাষ্টা করসি ব্যাটার উস্সারণ শুধরাইতে, কিন্তু পারি নাই"! ভারতীয় ভাষার নানা শব্দের ইংরেজি-উচ্চারণের সমস্যা এবং সাহেবদের হাতে তার অভিনব সমাধান প্রণালী সম্পর্কে আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। এক বন্ধুর 'ভট্টাচার্য্য' (Bhattacharyya) পদবীটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের কাছে হয়ে গিয়েছিল 'ব্যাটারি-চার্জার! রাজশ্রী ও রাজর্ষির সাহেবী ডাকনাম দাঁড়িয়েছিল Raja-she ও Raja-he। শুনেছি গান্ধীজীর 'মোহন' নামটির মাঝের 'h' টি উহ্য হয়ে তিনি ছাত্রজীবনে অনেকের কাছে হয়ে গিয়েছিলেন 'moan'। পরবর্তী জীবনে তিনি যে সাহেবদের আচার-ব্যবহার নিয়ে 'moan' করে মহাত্মা হয়েছিলেন তা ত সর্বজনবিদিত।

সিরিলের সঙ্গে বড়দার এই ঘনিষ্ঠতার একটা বিশেষ কারণ ছিল। সিরিলের পুত্র উইন্সটন, সংক্ষেপে উইন, ছিল বড়দার স্কুলের ছাত্র এবং বড়দার মাধ্যমে সিরিল স্কুলে তার পুত্রের কীর্তি-কলাপের খবর পেতেন। উইনের বয়স ছিল ১৫-১৬। প্রায় ছ'ফুট লম্বা এবং ছিপ-ছিপে গড়নের উইনকে খানিক্টা ক্রিকেটার Clive Lloyd এর মত দেখতে। দুষ্টু বন্ধুরা তার 'ক্লাইভ' পদবীটি ব্যবহার তাকে বলত Clive Void!

ইংল্যান্ডে তখন ৫ বছর থেকে ১৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। এর ফলে স্কুলগুলিতে একটা বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হত। যে সব ছেলে-মেয়ে একটা বয়সের পরে আর স্কুলে থাকতে চাইত না তারা স্কুল কর্তৃপক্ষের, বিশেষত শিক্ষকদের, দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ করে তুলত। বড়দার ছাত্র উইন্সটন ছিল এই দলের একজন। পুঁথিগত শিক্ষায় তার ছিল চূড়ান্ত অনীহা, তার ওপর সে বড়দার ইতিহাসের ক্লাসে স্থান পেয়েছিল অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ইতিহাস সহজ-বোধ্য হতে পারে এই বিশ্বাস থেকে।

ক্লাসের বাইরে বড়দাকে দেখলে সে বলে উঠত "there goes Golly Gosh"। মজাদার কথা কিছু শুনলে 'Oh, Golly' অথবা 'Oh, Gosh' বা শুধু 'Golly' বা 'Gosh 'বলে মৃদু বিস্ময় প্রকাশ করার একটা রেওয়াজ ইংরেজি ভাষায় আছে। তাই বড়দার নামের উচ্চারণ-বিকৃতিকে কাজে লাগিয়ে উইনের সৃজনশীল মস্তিস্ক এই সম্বোধনটি সৃষ্টি করে নিয়েছিল বড়দাকে বিরক্ত করে তুলতে। বড়দা চুপ করে থাকা নিরাপদ জেনে এই সব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করে চলার চেষ্টা করতেন।

কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম ঘটল। বড়দার ধৈর্য্যচ্যুতি হল ক্লাস চলার সময়। উইনের একক অপচেষ্টায় সেদিন বড়দার ক্লাসে পড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠছিল। অন্য একজন ছাত্র বড়দার দুর্গতিতে অস্বস্তি বোধ করেই বোধহয় উইনকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। তাতে আরও ক্ষেপে গিয়ে উইন্সটন তখন বড়দা সম্বন্ধে যে ভাষা প্রয়োগ করল তাতে রাগে, অপমানে বড়দা প্রিন্সিপ্যালসাহেবকে ব্যাপারটি জানালেন। উইনের শাস্তি হল স্কুল শেষ হবার পর এক ঘন্টার detention এবং বড়দার কাছে ক্ষমা চাওয়া। ক্ষমা চাইবে না বলায় তাকে পর পর দু দিন detention দেওয়া হল।

এই শাস্তির দু-একদিন পরে বড়দা যখন তার গাড়ির দিকে যাচ্ছেন উইন তাঁকে 'বেজন্মা' (bastard) বলে গালি দিয়ে উঠল। সেটি উপেক্ষা করে বড়দা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে একটি পদাঘাত এল উইনের থেকে। বড়দা ঘুরে দাঁড়াতে সহাস্য সে বলে উঠল "এটি তোমার পাওনা ছিল"। কথা না বাড়িয়ে বড়দা বাড়ি ফিরে গেলেন।

সেদিন যদিও শুক্র-শনিবার ছিল না, তাও বড়দার ইচ্ছা হল পাবে গিয়ে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে আসার। সিরিল পাবের নিয়মিত খদ্দেরদের একজন, তাই এই 'বেদিনেও' বড়দাকে দেখে সে হয়ে উঠল উৎফুল্ল। নিজের বিয়ারটির সঙ্গে সে বড়দার পছন্দের পানীয়টিও কিনল এবং সঙ্গে কিছু আলুর চিপ্স্।

'চিয়ার্স' ব'লে প্রথম চুমুক্টি দিয়েই সিরিল আলাপ শুরু করল "তা গশ, তোমার দিন কেমন কাটল আজ?" বড়দা বললেন "এই, মোটামুটি"। সিরিলের পুত্রের হাতে (মানে মুখে এবং পায়ে) অবমাননার কথাটা নিজ-মুখে বলতে বড়দার আত্মসম্মানে বাধছে, অথচ একদম এড়িয়ে যেতেও মন চাইছে না। এমন সময় এক সাহেব পাবে হাজির হলেন যিনি বড়দা এবং সিরিল দুজনেরই পরিচিত এবং পাবের আড্ডার সঙ্গী। বড়দা এবং সিরিল এক সঙ্গে বলে উঠলেন "হাই, ফিল"। এই সাহেবটির নাম ফিলিপ, সংক্ষেপে তাই 'ফিল'। ফিলিপ বড়দার সহকর্মী, গণিত এবং ভূগোল পড়ান। নিজের পানীয়টি সংগ্রহ করে ফিল দুই বন্ধুর সঙ্গে আড্ডায় বসে গেলেন। এ কথা সে কথার পর সিরিলই তাঁর ছেলের কথা পাড়লেন। "আচ্ছা বল ত আমার পুত্ররত্নটি তোমাদের মত দুই সুযোগ্য শিক্ষককে প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছে তো?' খানিকটা কৃত্রিমতা মেশানো এই ধরণের কথোপকথন ইংরেজের রীতি, সিরিল সেটি রপ্ত করেছেন।

বড়দা ফিলের দিকে তাকাতেই ফিল বলে উঠলেন "ভালো কথা মনে করেছ, উইন্সটনের ব্যাপারটা আমি ত ভুলেই যাচ্ছিলাম। আজ সে ক্যালের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তা সিরিলের নজরে আনা নিতান্তই উচিত"। এই "ক্যাল" শব্দটি বড়দার নামের আর একটি অপভ্রংশ, পরে বিশদ জানা যাবে। সিরিল ত শোনার জন্য উদ্গ্রীব। ফিল প্রথমে জানালেন যে ঘটনাটির কথা তিনি বলতে যাচ্ছেন সেটি তাঁর ঘরের জানলা থেকে তিনি দেখেছিলেন। বেশ গুছিয়েই ফিল ঘটনার আদ্যোপান্ত শোনালেন এবং

তাঁর সহকর্মী ক্যালকে জিজ্ঞেস করে নিলেন যে তিনি ঠিক বলেছেন কিনা। বড়দা সলজ্জ ম্লান হাসিতেই তাঁর সম্মতি জানালেন।

সব শুনে সিরিল ত ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বাড়ি ফিরে বজ্জাতটাকে (সিরিলের ভাষায় 'bastard'টাকে) কি কি শাস্তি তিনি দেবেন তা সবিস্তার বলতে শুরু করতেই ফিল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রস্তাব করলেন যে ঘটনাটি যখন স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে ঘটেছে এবং তিনি নিজে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, তখন স্কুলের শৃঙ্খলা-কমিটিকে জানিয়ে এর একটা বিহিত করাটাই বোধহয় ঠিক হবে। এই সব সাহেবী formality তে সিরিলের মত খেটে-খাওয়া কালো মানুষের আস্থা কম। আর বড়দাও চাইছেন না যে ব্যাপারটা বেশী জানাজানি হোক। কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর সিরিল একটি প্রস্তাব দিলেন যেটি অভিনব এবং তিন বন্ধুরই পছন্দসই। পরের রবিবার সিরিল বড়দা এবং ফিলকে দুপুরের দিকে তাঁর বাড়িতে আসতে বললেন যাতে উইনের উপস্থিতিতেই ব্যাপারটির ফয়সালার চেষ্টা করা যায়। বড়দা একটি শর্তে রাজি হলেন – রবিবারের আগে যেন উইন্সটনকে এই ব্যাপারে কেউ কিছু না বলেন।

শনিবারে আবার তিন বন্ধুর পাবে সাক্ষাৎ হল এবং পরের দিনের প্ল্যান পাকা করা হল। সিরিল আর এক ধাপ এগিয়ে তাঁর বন্ধুদ্বয়কে তাঁর বাড়িতে রবিবারের লাঞ্চেও নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি জানালেন যে সপরিবারে চার্চ থেকে ফিরতে তাঁর সকাল সাড়ে এগারোটা হবে, তাই বেলা বারোটার পরে যদি অতিথিরা আসেন তো তাঁর কোন অসুবিধা নেই।

বড়দার বাসস্থান থেকে সিরিলের বাড়ি হেঁটে গেলে বিশ-পঁচিশ মিনিট লাগে, বড়দা হাঁটা-চলার তেমন ভক্ত ন'ন, তাই গাড়ি চালিয়েই গেলেন। ফিল ছিলেন আরও একটু দূরের বাসিন্দা, তাই তিনিও এলেন গাড়িতে। সিরিল সাদরে বন্ধুদের তাঁর বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। বড়দা লক্ষ্য করলেন ঘরের আসবাবপত্র তেমন দামি না হলেও ঘরটি সুসজ্জিত এবং দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুওলির মধ্যে একটি মার্টিন লুথার কিং এর মুখ এবং তাঁর বিখ্যাত "I have a dream ..." বক্তৃতার কয়েকটা লাইন। সাদা দেশে কালো মানুষের আত্মপরিচয়ের সন্ধান আর কি।

গৃহকর্তা সিরিল হাঁক ছাড়লেন "গ্লেন্ডা, ডিয়ার, একটু এখানে এস ত, আমার বন্ধুরা এসে গেছেন"। গ্লেন্ডা তাঁর স্ত্রীর নাম। তিনিও কৃষ্ণাঙ্গী, পেশায় নার্স। হাসিমুখে গ্লেন্ডা অতিথিদের তাঁদের বাড়িতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানালেন এবং এ কথাও বললেন যে ছেলের মুখে তিনি তাঁদের নাম শুনেছেন। তাঁর স্বামীকে অতিথিদের যত্ন-আত্তি করার উপরোধ জানিয়ে তিনি রান্নাঘরে ফিরে গেলেন। হাল্কা পানীয় কিছু এল এবং তারপর আহারে বসার আহ্বান। উইন্সটনের প্রসঙ্গ এই পর্যায়ে অনুপস্থিত।

খাবার টেবিল ৬ জনের মত সাজানো হয়েছে। সিরিলের ডাকে উইন এবং তার ছোট বোন মার্থা এসে আসন নিল। গ্লেন্ডা সগর্বে মার্থার সঙ্গে অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মার্থা যে গ্রামার স্কুলের ছাত্রী এবং নেটবল খেলা ও ভায়োলিন বাজানোয় দক্ষ এ কথা গ্লেন্ডা জানালেন। ইংল্যান্ডে গ্রামার স্কুলে পড়তে হলে ১১ বছর বয়সে বেশ কঠিন একটি পরীক্ষায় পাস করতে হয়, তাই অতিথিরা বুঝলেন যে মার্থা বেশ মেধাবী এবং তার প্রতিভাও বহুমুখী। নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাবা-মা সিরিল ও গ্লেন্ডার ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে উচ্চাশা তাই অন্তত কিছুটা হয়ত সফল হবার পথে। শিক্ষকদ্বয়কে 'হ্যালো' বলে উইন চুপচাপই রইল। এঁদের হঠাৎ তাদের বাড়িতে আগমন কেন এ কথা তার মনে নিশ্চয় এসে থাকবে, কিন্তু সে তার কোন আভাস দিল না।

গ্লেন্ডা খাবার-দাবার বেশ যত্ন করেই বানিয়েছেন, বিভিন্ন পদ, কিছু ইংরেজি, কিছু বা নিজের দেশের, মানে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা। সকলেই বেশ তৃপ্তি করে খেলেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে গ্লেন্ডা জানালেন যে তাঁদের উইন ফটোগ্রাফিতে ওস্তাদ। তার দামী ক্যামেরা কেনার সামর্থ নেই, কিন্তু সাধারণ ক্যামেরা দিয়েই সে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের জন্মোৎসব, বিবাহ ইত্যাদিতে ছবি তোলে এবং কিছু পারিশ্রমিকও পায়। উইন বলে উঠল, "তা কখনই যথেষ্ট নয়। তবে যা পাই আমি সঞ্চয় করছি, এক সময় একটা 'লাইকা' বা 'রোলিফ্লেক্স' জাতীয় কোন ভাল ক্যামেরা কিনতে পারব"। ফিলেরও ছবি তোলার হবি আছে, সে উইন্সটনের সঙ্গে কিছুক্ষণ তাই নিয়ে আলাপ করল। এ যেন অন্য এক উইন্সটন। যাকে বড়দা চেনেনই না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গ্লেন্ডা সহ তিন বন্ধু আবার বসার ঘরে ফিরে এলেন। মার্থা ভার নিল কফি বানানোর। উইন্সটন চুপিসাড়ে সরে পড়ল।

কফি শেষ হলে সিরিল তার বন্ধুদের বললেন "এবার আসল কাজে নাম যাক"। তিনি বড়দা ও ফিলকে জানালেন যে উইনের ব্যাপারটা তিনি তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে ইতিমধ্যে জানিয়ে রেখেছেন যাতে আলোচনা সহজ হয়। উইনকে অবশ্য তিনি কিছু বলেন নি।

সিরিলের আহ্বানে ক্লাইভ পরিবারের সকলে বসার ঘরে সমবেত হতেই সময় নষ্ট না করে সিরিল আলোচনা শুরু করলেন। প্রথমে বলে নেওয়া ভাল যে ওয়েস্ট-ইন্ডিয়ানদের ইংরেজি ভাষার কথোপকথনে কিছু বিশেষ ভঙ্গী, অর্থাৎ 'mannerism', আছে, যেমন 'man' শব্দটি ব্যবহার করা, উচ্চারণ একটু টেনে, 'মা-ন' (maan)।

ফিল ও বড়দাকে দেখিয়ে সিরিল উইনকে জিগ্যেস করলেন "you know who these two friends of mine are, don't you, maan"? উইন মাথা নিচু করে জবাব দিল "হ্যাঁ"। শুনে তার দিকে তাকিয়ে সিরিল বললেন, "মা-ন, তুমি এই মিঃ গশের সঙ্গে সম্প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছ এটা আমার কানে এসেছে, যদিও গশের মুখ থেকে নয়। তুমি তাঁকে ঠিক কি বলেছিলে আমি তোমার মুখ থেকে আগে শুনতে চাই, বল ত"। মুখ না তুলেই উইনস্টন নিচু গলায় বলল "আমি রাগের মাথায় ওঁকে 'bastard' বলেছিলাম"। গলা একটু চড়িয়ে সিরিল প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি জানো না, মা-ন, যে এই শব্দটি 'very rude"? প্রায় দশ-বারো সেকেন্ড সবাই চুপ-চাপ। তারপর উইনস্টন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে জবাব দিল "আমি জানি, কিন্তু তুমিও ত সারাক্ষণ বাড়িতে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাক, তাই না"? ঘরে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল, সবাই অস্বস্তিতে। সিরিল কি করবেন কে জানে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সিরিল গলা পরিষ্কার করে শুরু করলেন "Yes, maan, I do'. তার কণ্ঠস্বরে কাতরতা, প্রায় কান্নার ছোঁয়া। বড়দা তাকিয়ে দেখলেন সিরিলের চোখ ভেজা। সিরিল বলতে থাকলেন "আমি একজন অশিক্ষিত বাস-কন্ডাক্টার। তোমার মা এবং আমি নিজেদের গরীব দেশ ছেড়ে এই বিদেশে এসে অনেক অনাদর-অপমান সহ্য করে পরিশ্রম করে যাচ্ছি এই আশায় যে তোমরা এখানকার সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে জীবনে উন্নতি করবে এবং সামাজিক স্বীকৃতি পাবে। এটা কি তুমি বা তোমার বোন কখনও ভেবে দেখেছ"? উইন কিছু বলার আগে মার্থা বলে উঠল "বাবা, তুমি আর কক্ষণও নিজেকে বা আমাদের মাকে ওই ধরণের ভাষায় পরিচয় দেবে না। এটা আমার এবং, আমি নিশ্চিত, উইনেরও একান্ত অনুরোধ। তোমরা দুজনেই আমাদের গর্বের এবং শ্রদ্ধার পাত্র জানবে"। সিরিল ধরা গলায় বললেন "অনেক ধন্যবাদ, ডার্লিং, কিন্তু আমার এই কথাগুলি বলার দরকার ছিল"।

তারপর উইনস্টনকে সম্বোধন করে সিরিল বললেন, "look, maan, তোমার এখন কি করা উচিত, তা আমি বলব না, আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।" উইন্ চেয়ার থেকে উঠে বড়দার কছাকাছি গিয়ে বলল "স্যার, সেদিন আপনার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছি তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিন। কথা দিচ্ছি, আমি আর কখনও এই ধরণের ব্যবহার করব না"।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বড়দা শুনলেন তাঁর চির-অবাধ্য, দুর্বিনীত ছাত্রের এই অনুশোচনা এবং ক্ষমা প্রার্থনা। নিজের অনুভূতিকে সামলে বড়দা শুধু বললেন "I do understand Winston, don't feel guilty".

ফিল সাহেব-মানুষ, নিজের দেশেই থাকেন, এই সব 'কালচার-কনফ্লিক্ট' তাঁকে স্পর্শ করার কথা নয়। কিন্তু ঘটনা-প্রবাহের এই অসাধারণত্বে তিনিও অভিভূত। ব্যাপারটিকে লঘু করতে তিনি বলে উঠলেন "Come on now Winston, you are a big lad, let's be mature mates from now on, eh?"

"And mind our language too, maan", সিরিল যোগ করলেন। সবাই সশব্দে হেসে উঠল এবং ঘরের আবহাওয়া আবার স্বাভাবিক হল।

গ্লেন্ডার অনুরোধে মার্থা অতিথিদের কিছুক্ষণ ভায়োলিন বাজিয়ে শোনালো। উইন ফিল এবং অন্যান্য সকলকে তার তোলা কিছু ছবি দেখাল। এই সব নিয়ে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ফিল ও বড়দা সিরিলের পরিবারের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। এর পর আরও বছর খানেক উইনস্টন স্কুলে ছিল, কিন্তু তার কোন দুর্ব্যবহারের কথা আর শোনা যায় নি। তার দুঃখী পিতার বক্ষফাটা হাহাকারটিই হয়ত ছিল তার এই পরিবর্তনের কারণ।

ফাস্ট-ফরোয়ার্ড ১২টি বছর। ফিল উত্তর ইংল্যান্ডের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে লন্ডন ছেড়ে চলে গেছেন। বড়দা একটি দু-ঘরের ফ্ল্যাট কিনে নিজের মত বসবাস করতে শুরু করেছেন। সিরিল প্রায় ২৫ বছর কাজ করার পর একটু আগে-আগে রিটায়ার করে সস্ত্রীক ত্রিনিদাদে ফিরে গেছেন, মাতৃভূমির খোলা-মেলা উষ্ণ পরিবেশে একটু বিশ্রাম পাবার প্রত্যাশায়। আর উইনস্টনের অসহনীয় ছাত্রজীবনও শেষ হয়ে গেছে একসময়। কে আর খবর রাখে কোথায় সে। বড়দা একা মানুষ, তাই পুরোপুরি রিটায়ার করে যেতে ভরসা পান না, সপ্তাহে ২ দিন করে স্কুলে পড়াতে যান।

গ্রীষ্মের ছুটির পর বড়দার স্কুল খুলেছে, সামনে শীতকাল। কিছু শীতবস্ত্র কেনার জন্য বড়দা একদিন লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীট অঞ্চলে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় টিউব স্টেশনে অপেক্ষা করছেন এমন সময়

এক কালো যুবক, বেশ স্যুটেড-বুটেড, কাছে এসে বড়দাকে বলল "হাই, মিঃ গশ!" বড়দা বললেন "আরে, তুমি ত উইন্সটন, তাই না?" উত্তর দেবার প্রয়োজন রইল না, উইন হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকের জন্য। সে বলল "বিশ্বাস করবেন না, আমি বেশ কিছুদিন ধরেই আপনার সঙ্গে কি করে যোগাযোগ করা যায় তাই ভাবছিলাম, আজকের এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতটা তাই খুবই সৌভাগ্যজনক"। পকেটে থেকে একটি বিজনেস কার্ড বের করে বড়দার হাতে দিয়ে উইনস্টন বলল "আজ আমার একটু তাড়া আছে, তাই কথা বলতে পারছি না, প্লিজ আমাকে বাড়ির নাম্বারে একটা ফোন করবেন দু-একদিনের মধ্যে, সন্ধ্যা ৮ টার পর। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। হাত-ঘড়ির দিকে চট্ করে তাকিয়ে সে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তায় পা বাড়াল।

বড়দা উইনস্টনের কার্ডটিতে চোখ বোলাতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে তার বাড়ির ঠিকানা আর ব্রিক্সটন নেই, পাল্টে 'ডালিচ' (Dulwich) হয়েছে। ডালিচ ভৌগলিক বিচারে ব্রিক্সটনের কাছাকাছি হলেও, পাড়া হিসেবে অনেক উচ্চস্তরের। অবস্থাপন্ন উচ্চ মধ্যবিত্তের জায়গা। উইন্সটন সম্বন্ধে বড়দার কৌতূহল আরও বাড়ল।

পরের দিন শুক্রবার, বড়দা রাত ন'টা নাগাদ উইনকে ফোন করতে, উত্তর এল এক মহিলার কণ্ঠে। তিনি বড়দার পরিচয় জানতে চাইলে বড়দা একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলেন "আমার নাম মিঃ ঘোষ"। মহিলা বললেন "ও বুঝেছি। ধরুন, আমি উইনকে জানাচ্ছি। বড়দা শুনতে পেলেন "এই উইন, তোমার গশ ফোন করছেন"। উইন ফোন করার জন্য বড়দাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে কথাবার্তা শুরু করল। কি ভাবে আবার এক সঙ্গে হওয়া যায় সে কথা উঠতে উইন জানতে চাইল বড়দা 'Mad King' এ এখনও যান কিনা। বড়দা বললেন যে তিনি কখনো-সখনো গিয়ে থাকেন। ঠিক হল পরের দিন সন্ধ্যা ৬ টার দিকে উইন তার ঐ অঞ্চলের কিছু কাজ সেরে পাবে আসবে বড়দার সঙ্গ-সুখের আশায়।

শনিবার বড়দা একটু আগে-আগেই 'ম্যাড কিং' এ হাজির হলেন। এই পাবের দীর্ঘ দিনের মালিক হ্যারি দু-এক বছর হল পাবটি বিক্রি করে আয়ারল্যান্ডে ফিরে গেছে। নতুন মালিক কালো, জামাইকান, নাম আর্থার। সেও বড়দার পরিচিত, তার ছেলে অ্যালভিনও বড়দার ছাত্র ছিল। তার কাছে বড়দা জানলেন যে উইন একটি টিভি কোম্পানিতে ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করে এবং সে বিবাহিত। ইতিমধ্যে উইন এসে হাজির হয়ে বড়দাকে এবং তার আঙ্কল আর্থারকে হ্যান্ডশেক করে আসন গ্রহণ করল। আজকের প্রথম ড্রিঙ্কটি, আর্থার জানাল "on the house"। অর্থাৎ তার সৌজন্যে, বিনামূল্যে।

একটি করে বিয়ারের ছোট গ্লাস নিয়ে উইন এবং বড়দা বার-বছরের "catch-up" এ বসলেন। উইন প্রথমেই বলে নিল যে তার বোন মার্থা এখন আর ইংল্যান্ডে থাকে না। অক্সফোর্ড থেকে মিউজিক এবং ইংরেজি সাহিত্যে সে ডিগ্রী করেছে। তারপর মরিশাস থেকে আসা এক ফরাসী সহপাঠীকে বিয়ে করে তারা দুজনেই মরিশাসে বসবাস করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে।

নিজের কথায় এসে উইন জানাল যে ১৬ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে সে প্রথমে একটি ফটোগ্রাফির দোকানে সেলস্‌ম্যানের কাজ পায়। দোকানটির মালিক ছিলেন ভারতীয়, নাম নানুভাই প্যাটেল। তাঁর পরামর্শে উইন নাইট স্কুলে ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত একটি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়। অবসর সময়ে আগের মতই সে বিয়ে-পৈতে জাতীয় অনুষ্ঠানের ছবি তোলার কাজ করত।

ইতিমধ্যে নানুভায়ের গুরুস্থানীয় এক হিন্দু সাধুবাবার আগমন ঘটল লন্ডনে। নানুভাই উইনকে দায়িত্ব দিলেন গুরুদেবের সঙ্গে থেকে তাঁর যাবতীয় কাজকর্মের ছবি তোলার। তিন সপ্তাহের assignment, বেশ মোটা টাকার। উইন খুশী হয়েই কাজে লেগে গেল। সাধুবাবার ভক্তদের মধ্যে অনেক সাহেব-মেমও ছিলেন। উইন সুযোগ মত তাঁদের সঙ্গে আলাপ করত।

একদিন সাধুটির এক সাহেব ভক্ত, নাম পিটার, কথাপ্রসঙ্গে উইনকে জানাল যে সেও একজন ফটোগ্রাফার, কাজ করে একটি প্রাইভেট টিভি কোম্পানিতে। উইনকে বলল একদিন তার অফিসে এসে দেখা করতে যাতে তারা একসঙ্গে কফি খেতে খেতে কথাবার্তা বলতে পারে। টেলিফোনে দিন-ক্ষণ ঠিক করে উইন যেদিন পিটারের অফিসে হাজির হল সেদিনটি তার জীবনের সবচেয়ে শুভদিন হয়ে দাঁড়ালো। এই কোম্পানি একজনকে খুঁজছিল যে পিটারের সঙ্গে একজন বিদেশী 'ভি-আই-পি'র ভিজিট কভার করবে। লেখার কাজটা প্রধানত পিটার করবে আর ফটো তোলাটা থাকবে উইনের দায়িত্বে। পিটার তাকে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে রাজী করাল। ভি-আই-পি টি মাসখানেক ধরে সারা দেশ ঘুরলেন, সঙ্গে বিভিন্ন টি ভি এবং অন্যান্য সংবাদ-সংস্থার কর্মীরা। উইন খুব মন দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করল। তার কাজে ও পেশাদারিত্বে পিটার খুব খুশী।

এই assignment টি শেষ করে যখন তারা লন্ডনে ফিরে এল, পিটারের কোম্পানি তারই সুপারিশ মত উইনকে অফার দিল তাদের হয়ে ফুল-টাইম কাজ করার। একটা শর্ত, উইনকে পার্ট-টাইম একটি জার্নালিজম কোর্স করতে হবে, যার খরচ কোম্পানিই দেবে। উইন ত হাতে স্বর্গ পেল। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সে তার নতুন জীবনে মন দিল এবং এই পেশাদারী শিক্ষায় সে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিতে লাগল।

আর একটি ব্যাপারও সোনায়-সোহাগার মত ঘটে গেল। এই কোম্পানিতেই কাজ করে একটি যুবতী জার্নালিস্ট অল্প দিনের মধ্যেই উইনের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার পরিবারের আদি বাসস্থানও ত্রিনিদাদে। অল্পদিনের পরিচয়েই তারা বিয়ে করল। তার নাম ও অন্যান্য পরিচয়ে পরে আসা যাবে।

ঘন্টাখানেক পাবে কাটিয়ে উইন বলল তাকে উঠতে হবে। যাবার আগে সে বড়দাকে জানাল যে তার বাবা-মা দু দিন পরেই ত্রিনিদাদ থেকে তার কাছে বেড়াতে আসছেন মাসখানেকের জন্য। আর বলল যে তার বাবা সিরিল তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন বড়দাকে খুঁজে বের করতে যাতে দুই বন্ধুর আবার দেখা হয়। সে বড়দাকে পরের শুক্রবার বিকেলের দিকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল আর অনুরোধ করল ইতিমধ্যে বড়দা তার বাড়িতে যেন যোগাযোগ না করেন কারণ বাবাকে সে সারপ্রাইজ দিতে চায়। আর চোখ টিপে এটাও বলল যে বড়দার জন্যও কিছু সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে।

ঠিকানা খুঁজে বড়দা বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাজির হলেন উইনের বাসস্থানে। বাইরে থেকে লক্ষ্য করলেন বাড়িটি দু-তলা, বিলেতে যাকে বলে 'থ্রি-আপ-টু-ডাউন', অর্থাৎ ওপরে তিনটি শোবার ঘর এবং নীচের তলায় বসার ও খাবার ঘর। উইনই দরজা খুলে বড়দাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাল। কুশলাদি বিনিময়ের পর বড়দাকে বসিয়ে সে দোতলার সিঁড়ির কাছে থেকে হাঁক ছাড়ল, "ড্যাড্, একটু নিচে এস তো, দরকার আছে"। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিরিল নেমে এলেন এবং বড়দাকে দেখে হৈ-হৈ করে উঠলেন, "আরে গশ, তুমি এখানে এসে একা বসে আছ আর আমি ওপরে বিছানায় শুয়ে 'বোর' হচ্ছিলাম। দেখছ তো, উইনটা আমার এখনও মানুষ হয় নি, তার ভাল-মন্দের জ্ঞান হয় নি। এই সব তোমাদের, মানে মাস্টারদেরই, দোষ"। পুরনো দুই বন্ধুর পুনর্মিলন শুরু হল উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে।

কিছুক্ষণ সময় তাদের নিজেদের মত কাটাতে দিয়ে উইন আবার ফিরে এল এবং হাসি মুখে তার বাবাকে বলল "কি, কেমন লাগল তোমার সারপ্রাইজটা"? সিরিল কৃত্রিম তিরস্কারের স্বরে বলল "শাট আপ, এ্যান্ড লীভ আস এলোন"। হাসিমুখেই উইন উত্তর দিল "এবার মিঃগশের পালা, একটু অপেক্ষা কর"। নির্বিবাদি বড়দা চুপ করেই রইলেন। বড়দা লক্ষ্য করলেন যে বসার ঘরটির সংলগ্ন একটি কাঁচের দেওয়াল-ওয়ালা extension রয়েছে যাকে বলা হয় sun lounge, শীতের দেশে ঘরের মধ্যেই একটু রোদ-পোহানোর ব্যবস্থা। এই ঘরে রাখা একটি pram ও বড়দার নজর এড়ালো না।

এদিকে সিরিলের বিয়ার-তৃষ্ণা তাকে পাঠিয়েছে রান্নাঘরের ফ্রিজের দিকে এমন সময় দরজা খোলার শব্দ এবং নারী-কণ্ঠের কাকলি বড়দার কানে এল। তাকিয়ে দেখলেন দুই মহিলা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। সিরিল ফিরে এল বিয়ারের দুটি বোতল এবং দুটি সুদৃশ্য গ্লাস হাতে নিয়ে। গ্লাস-দুটিতে বিয়ার ভরে সিরিল বড়দার হাতে একটি দিলেন এবং বন্ধুর দীর্ঘজীবন কামনা করে তৃপ্তিভরে গ্লাসে চুমুক দিলেন। তারপর সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লেন, "Glenda, dear, come down and join us"। উত্তর এল "Yes, dear, we are coming"।

পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই গ্লেণ্ডা নেমে এলেন সঙ্গে এক সপ্রতিভ যুবতী যার পরণে সিল্কের শাড়ি। বড়দাকে সহাস্য অভিবাদন জানিয়ে গ্লেন্ডা বলল "আমার পরম আদরের পুত্রবধূ উষার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই"। হাতদুটি একসঙ্গে করে হাসি-মুখ যুবতী বলে উঠল "নমস্তে"। সারপ্রাইজ বলে সারপ্রাইজ, বড়দা তো হতভম্ব।। গ্লেণ্ডা বললেন, "মিঃ গশ, তোমার ঘাবড়ে যাবারই কথা, আমরা সব ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, দু মিনিট সময় দাও"। উইনও ইতিমধ্যে এসে গেছে এবং মিটি মিটি হাসছে।

ঊষাই ব্যাখ্যা করল, "মিঃ ঘোষ, আমি ত্রিনিদাদে জন্মেছি, কিন্তু আমরা ভারতীয়। আমার ঠাকুর্দার বাবা ঠিক কখন এসেছিলেন ভারত থেকে আমরা জানি না, কিন্তু আমার ঠাকুর্দা ত্রিনিদাদে জন্মেছিলেন। আমার বাবার যখন চার বছরের মত বয়স তখন তাঁর পিতা মারা যান। আমার বাবার বয়স এখন প্রায় সত্তর, তিনিও ত্রিনিদাদে জন্মেছিলেন। আমার বাবা ইংল্যান্ডে পড়তে এসে মরিশাস থেকে আসা একটি ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তিনিই আমার এবং আমার এক বড় ভাইয়ের মা। আমার বাবা ত্রিনিদাদের ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে কাজ করতেন, বিভিন্ন দেশ ঘুরে ইংল্যান্ড থেকে রিটায়ার করেন। এই বাড়িটি বাবাই কিনেছিলেন এবং তিনি এখানে আমাদের নিয়ে বসবাস করতেন। আমার বাবার নাম সূর্যপ্রসাদ বিশ্বাস। আমার মা ক্যান্সারে মারা গেছেন কয়েক বছর হল, তাঁর নাম ছিল অরুণা আইয়ার। আমার ভাই কালিপ্রসাদ, ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকায় থাকে"। বাবা

এখনও ত্রিনিদাদ সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন, পোর্ট-অফ-স্পেনেই থাকেন, সমুদ্রের ধারে সরকারি বাংলোয়।

এই পর্য্যন্ত বলে ঊষা থামল। এবার বড়দার পালা। তিনি জানতে চাইলেন 'বিশ্বাস' পদবীধারী ঊষার পরিবার বাঙ্গালী কিনা। ঊষা হেসে জবাব দিল যে অনেকেই তাদের এই প্রশ্ন করে থাকে, কিন্তু এর সঠিক উত্তর সে বা তার বাবা জানেন না। তবে তার ঠাকুর্দার মাতৃভাষা ছিল হিন্দি, বাংলা নয়। ইংরেজি তিনি অল্পই জানতেন। ঊষার ধারণা তার পূর্বপুরুষ বিহার বা উত্তর প্রদেশের কোথাও থেকে ত্রিনিদাদে গিয়ে থাকবেন।

বড়দা বললেন তোমাদের বাড়ি তো তাহলে "A House of Mr Biswas", V S Naipal জানলে মজা পেতেন। ত্রিনিদাদের খ্যাতিমান সন্তান নইপল বড়দার একজন প্রিয় লেখক। তাঁর লেখা 'A House for Mr Biswas' বড়দা তাঁর ইংরেজির ক্লাসে অনেক সময় ব্যবহার করেছেন তাঁর ওয়েস্ট-ইন্ডিয়ান ছাত্রদের আত্মসচেনতা জাগানোর ইচ্ছায়। ঊষা বলল "আমার বাবা নইপলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং 'ঊষা' নামটি তাঁরই দেওয়া। তার বাবা কন্যা হওয়ার সুখবরটি সাহিত্যিক বন্ধু নইপলকে জানাতে টেলিফোন করেন এবং কি নাম রাখা যায় আলোচনা করেন। নইপল বলেন যে মেয়ে যখন ভোরবেলায় জন্মেছে তার নাম 'ঊষা' রাখ। আমার মা সবসময় বলতেন যে তাঁর নিজের 'অরুণা' নামের সঙ্গেও 'ঊষা' নামটি বেশ খাপ খায়।

এর মধ্যে উইন কখন সরে পড়েছে কেউ তেমন লক্ষ্য করে নি, কিন্তু সে ফিরে এল বড়দার জন্য আর একটি সারপ্রাইজ সঙ্গে নিয়ে। সেটি তাদের শিশু-কন্যা, বয়স সবে চার সপ্তাহ। ঊষা মেয়েকে কোলে নিয়ে বড়দার কাছে গিয়ে বলল "এখন থেকে আপনি আমার "আঙ্কল" এবং আমার মেয়ে আপনার নাতনী। আশীর্বাদ করুন যেন সুস্থভাবে বড় হয় এবং জীবনে সুখী হয়"। বড়দা শিশুটির মথায় হাত রেখে বললেন "may you grow up to be your family's pride and joy"।

সিরিল হাসিমুখে সব দেখছিলেন, সবাইকে হাসিয়ে তিনি বলে উঠলেন "গশ ছিল আমার একার, এখন হয়ে গেল বারোয়ারি সম্পত্তি, একেই বলে বৃদ্ধ বয়সের দূর্ভাগ্য"। গ্লেন্ডা বললেন, "পরম সৌভাগ্য বল"। সিরিল স্বগতোক্তির মত জবাব দিলেন, "হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, আমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে, প্রভু যীশুর কৃপায় আমার সংসার আজ সুখ-শান্তিতে ভরা, তাই না গশ?" বড়দা মৃদু হাসিতে সম্মতি জানালেন। সিরিল মনে করিয়ে দিলেন যে তাঁর বুদ্ধিমতী বৌমাটি তাঁর জন্য বড়দার মত একটি সুশিক্ষিত ব্রাদারও সংসারে এনে দিয়েছে। সবাই হেসে উঠল।

ঊষা বলল বড়দার কাছে তাদের আর একটি চাহিদা আছে। উইনের পরিবার ক্রিশ্চান, তার কন্যার নামকরণ হবে চার্চে, পরের সপ্তাহে, বড়দাকে আসতেই হবে। বড়দা খুশি হয়েই সম্মত হলেন।

রাতের আহারাদি সিরিলের পরিবারেই সেরে বড়দা বাড়ি ফিরলেন নতুন অভিজ্ঞতার ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে। নিঃসঙ্গ ব্যচিলর-জীবনে তিনি যেন একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল খুঁজে পেলেন। তিনি এটাও চাক্ষুষ দেখলেন যে সাদা মানুষের দেশে কালো তরুণেরা সামাজিক অবজ্ঞা ও অবহেলা কাটিয়ে যখন মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখে তখন তাদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মানবোধ ফিরে আসে - যেমন এসেছে উইনের। যে দেশ বড়দার নিজের সেখানকার সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, কালো-ফর্সা, ভদ্রলোক-ছোটলোক নিয়ে যে সব বিভেদ অনাদি কাল থেকে চলে আসছে তার কুফলের কথা বড়দার অজানা নয়। সাদাদের দেশে কালো উইনের এই সামাজিক 'নবজন্ম' তাই বড়দাকে আনন্দ দিল।

পরের সপ্তাহের চার্চের অনুষ্ঠানে অনেক পুরনো ছাত্র ও তাদের পিতামাতার সঙ্গেও বড়দার আবার দেখা হয়ে গেল। চার্চের যাজক কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি আগে সারলেন, তারপর নামকরণের পালা। যাজক জানতে চাইলেন কোন নাম ঠিক করা হয়েছে কিনা যাতে নামটিকে তিনি যীশুর নামে উৎসর্গ করে দিতে পারেন। ঊষা বলে উঠল "নামটি আমি ছাড়া আর কেউ এখন পর্য্যন্ত জানে না। নামটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে যেটি আমি সকলের উপস্থিতিতেই ব্যাখ্যা করব"। সমবেত অতিথিরা বেশ ঔৎসুক্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন কি সেই নাম তা জানতে।

ঊষা বড়দাকে অনুরোধ করল তার কাছে এসে তার কন্যার মাথায় হাত রাখতে। 'যথা আজ্ঞা' বলে বড়দা এগিয়ে গেলেন তাঁর কর্তব্য সারতে। ঊষা গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল "সকলে মন দিয়ে শুনুন আমার আর উইনের মেয়ের নাম কল্যাণী"। তার উচ্চারণ পরিষ্কার ভারতীয়, কোন বিকৃতির চিহ্ন নেই। ইংরেজি তর্জমা করে সে বলে দিল "giver of goodness or well-being"। বিস্ময়ে ও আনন্দে বড়দা ত বিহ্বল। সবাই ভাবছে এ আবার কেমন নাম। ঊষা বলল "আপনারা সবাই মিঃ ঘোষকে তাঁর পদবীর বিকৃত উচ্চারণের মাধ্যমেই জেনে এসেছেন এতদিন। এখন শুনুন যে ওঁর পুরো নাম 'কল্যাণ' ঘোষ এবং আমার মেয়ের নাম কল্যাণেরই স্ত্রীলিঙ্গ। মিঃ ঘোষ আমার শ্বশুরমশায়ের দীর্ঘদিনের বন্ধু তাই তিনি আমাদের পরিবারেরই সদস্য। আমার মেয়ের নাম তাই তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ধন্য হলাম।

ঊষা বড়দাকে বলল তার মেয়েকে ভারতীয় রীতিতে আশীর্বাদ করতে। বড়দা শিশু কন্যাটির মাথায় হাত রেখে বললেন "কল্যাণমস্তু"। ইংরেজি করে বলে দিলেন "may you have enduring goodness"। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

উইন পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বড়দার কাঁধের ওপর হাত রেখে ফিসফিস্ করে বলল "আমি অতশত বুঝি না, আজ থেকে তুমি আমার আঙ্কল গশ, রাজি তো?" নিজের অজান্তেই বড়দা বলে উঠলেন "ও মাই গশ"। বড়দার নাম-বিকৃতির বৃত্তটি যেন পরিপূর্ণ হল।

গ্লেন্ডা এবং সিরিল সকলকে আমন্ত্রণ জানালেন তাদের পরিবারের সঙ্গে জলযোগে যোগ দিতে। ভোজন-রসিক বড়দা মনে মনে আওড়ালেন "মধুরেণ সমাপয়েৎ"।

(অন্যত্র প্রকাশিত এই গল্পটি লেখকের সম্মতিক্রমে 'অঞ্জলিতে' পুনর্মুদ্রিত হোল)

মস্কোর মকশো

- রাজা মুখার্জ্জী

বাজারই যে প্রকৃত শিক্ষক এবং জাগতিক পাপ-পূণ্যের বিচারক এ কথা আমি জন্মাবধিই শুনে আসছি। শুধু শুনে কেন দেখেও আসছি। '৯২ সালের অনেক আগে থেকেই এবিষয়ে আমাদের, মানে জন্মসূত্রে উত্তর কলকাতার গলি ঘিঞ্জির ছাপোষা গেরস্থদের সম্যক উপলব্ধি ছিল। শুধু সময়মত বাহারি নামকরণ করে রঙচঙে মোড়কে পরিবেশন করতে পারলেই কেল্লাফতে হতে পারত। কিন্তু বাঙালী চিরকালই অলস জাত। তার ওপর বাইরের চাকচিক্যটা কোনদিনই তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না। না হলে সব রেডি করে রেখেও মার্কনি সাহেব অমন টুক করে এসে জগদীশ বাবুর হাত থেকে নোবেলটা নিয়ে যেতে পারতেন ! হাল আমলে মানিক বাবুর বসার ঘর থেকে ই.টির চিত্রনাট্যটা যে খোয়া গেছিল, ফেলু মিত্তিরও ফেল মেরে গেছিল তা খুঁজে পেতে। সে যা হোক ওসব তো আর ফিরে আসবে না।

উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজার থেকে নেতাজীর ঘোড়ার ল্যাজ ধরে গঙ্গার দিকে যাত্রা করলে, যতীন্দ্র মোহন এভেন্যুর ঠিক মুখটাতে যে মস্কো বলে একটা ক্ষুদ্র জনপদ আছে, মানে ওই ছ-আট ফুট চওড়া আর মেরে কেটে বিশ-তিরিশ হাত লম্বা, ওপরের কিছুটা একটা পুরনো বাড়ির গাড়ি বারান্দার আড়াল, সে কথা অনেকেই জানেন না। বছর তিন চার আগে অবিশ্যি একবার এক কাগজে বেড়িয়েছিল খবরটা। কিন্তু কাগজওলারা এগিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও আমরা ওসব ভুলে মেরে খেয়ে, আবার পিছিয়ে পড়েছি। আমার জন্ম বেড়ে ওঠা সবই ওই মস্কোর একেবারে গাড়ি বারান্দা ঘেঁষে বলা যায়। জায়গাটা এখনও আছে, নামটাও। অতীতের সাক্ষী হিসেবে পাশের মাঠ থেকে তুলে আনা দুটো আদ্যিকালের কাঠের বেঞ্চিও আছে বহাল তবিয়তে। কিন্ত যা হারিয়ে গেছে তা হল সেই মানুষগুলো আর তাদের মেধা। আমি স্বচক্ষেও এমন অনেককে দেখেছি, যাদের কীর্তিকলাপ আজকের সময় হলে, সোশ্যাল মিডিয়া কেন, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অনেক গুলো ঘন্টা খানেক জাস্ট গিলে নিত।

এই যেমন অশোকদা। বলছি বটে দাদা, আসলে আমার এক মামাও ওঁকে দাদা বলত। পোশাকি নাম অশোক গুপ্ত। মস্কোই ঘর-বাড়ি। শুধু দুপুর বেলা আর রাতে খাবার জন্য ঘরমুখো হওয়া। আজকের কলকাতায় এই যে দুগগা পুজোর থিম যাকে বলে, ওই একটা কোন বিষয় নিয়ে বিস্তর ক্যালোরি ঝরানো ভাবনা চিন্তা আর টাকা পয়সা খরচা করে, আধো আলো আধো অন্ধকার গোছের কিছু একটা খাড়া করে দেওয়া, যা দেখে কেউ কেউ বুঝে আর অনেকেই না বুঝে, মাথা নেড়ে আঁতলামির ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বিস্তর জ্ঞান ঝাড়বে, সেই থিম পঞ্চাশের দশকেই নামিয়ে দিয়েছিলেন সহজাত দক্ষতায়। আজকে যাঁরা প্রথিতযশা থিম শিল্পী তাঁরা প্রায় সকলেই ওনাকে থিম পুজোর পথিকৃৎ মনে করেন। মস্কোর পাশেই একটা মাঝারি মাপের মাঠ আছে, সেখানে উনি ঠাকুর গড়তেন। জমিদার বাড়ির নাতি, কিন্তু শিল্পী হবেন বলে, বাড়ি ছেড়ে আস্তানা গেড়েছিলেন সে সময়ের প্রখ্যাত শিল্পী সুনীল পালের বাড়িতে, মস্কোর উলটো দিকে। আমরা যখন ওনাকে দেখেছি, তখনও উনি ঠাকুর গড়েন, একটা ছোট্ট গলির মধ্যে ওনার বাড়ির সামনে। সপ্তমীর দিন সকাল বেলা পুরোহিত পাশে রাখা একটা ছোট্ট একচালা ঠাকুরে পুজো করছেন আর উনি মগ্নচৈতন্য হয়ে ওনার শিল্প সাধনায় রত। মন্ডপ বা প্রতিমার আশপাশে কোথাও ওঁর নামটাও লেখা থাকত না কখনও, কেউ জানতেও পারত না, এতটাই প্রচার বিমুখতা। অষ্টমীর দিন প্রায় প্রতি বছরই বেড়িয়ে পরতেন কেদার বদ্রী বেড়াতে। প্রায় বার পনের ওই একই জায়গায় ঘুরতে গেছেন। নিজের ঠাকুরের বিসর্জন উনি দেখতেন না। এই অশোকদা যখন মধ্যগগনে, আজকের এক বিখ্যাত শিল্পী নেহাতই বাচ্চা ছেলে তখন, মাঠে এসে অশোকদার ফাই ফরমায়েশ খাটতো, আর তার বদলে কখনও সখনও প্রতিমার চালচিত্র বা অন্য কোনখানে একটু রঙ লাগানোর সুযোগ পেত। অশোকদার বিষয় ভাবনায় চন্ডী থেকে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করে, সমকালের প্রেক্ষিতে তার চিত্ররূপ। সেখানে '৫৯ এর খাদ্য আন্দোলন, '৭৫ এর জরুরী অবস্থা বা তেল-যুদ্ধ সবই অক্লেশে জায়গা করে নিত। একবার প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় গৌর কিশোর ঘোষ একজন জাপানী সাহিত্যিক Yukio Mishima কে নিয়ে এসেছিলেন অশোকদার কাজ দেখাতে। উনি মুগ্ধ হয়ে ফিরেছিলেন। দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে ওনার হাতে আঁকা একটা রবীন্দ্রনাথের ছবি ছিল দেওয়ালে টাঙানো। ওনারই উপহার দেওয়া। অশোকদার কথা বলতে গেলে এই লেখার পুরো টাই লেগে যাবে তা-ও হয়ত শেষ হবে না।

আর একজন ছিলেন পশুপতিদা আসলে আমার দাদুর চেয়ে সামান্য কমবয়সী। ইংরেজির মাস্টার মশাই। ওই মস্কোতে বসেই কলেজের ছেলেপিলেদের শেক্সপীয়র পড়াতেন মাঝে মাঝে। এ আমাদের চোখে দেখা। তখন আমরা বেশ ছোট। স্কুলে বোধহয় শেক্ষ কবির নামটা সবে ঠিকঠাক করে লিখতে শিখছি। উনি যে অমনভাবে সমস্ত শরীর দিয়ে যাকে বলে কায়মনোবাক্যে ম্যাকবেথ পড়াচ্ছেন, সেটা বুঝতেই পারতাম না পাড়ারই এক দাদা না বলে দিলে। ইংরেজি কথোপকথন মাথামুন্ড কিছু না বুঝেও বাকরুদ্ধ হয়ে দেখেছি - এভাবেও পড়ানো যায় ! রাস্তার ফুটপাথে চায়ের দোকানে। পরনে বেশীরভাগ সময়ই লুঙ্গি আর একটা ফতুয়া, সাথে বিড়ি। চশমার কাঁচ দুটো সেই হরলিক্সের শিশির তলাটা। শীতকালে অবশ্য ওনাকে চিনতেই পারতাম না। গোটা দুই সোয়েটারের ওপর মাঙ্কি টুপি আর পায়ে মোজার সাথে একটা, থুড়ি আদ্দেক হাওয়াই চটি পরে রণসাজে সজ্জিত হয়ে ওই মস্কোয় চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে বসে থাকতে দেখলে মস্কোর নামকরণ স্বার্থক মনে হত।

এখানে মৃণাল সেন মাঝে মাঝে আসতেন শুনেছি। মস্কোর চা খেতে আর কিছু মণি-মাণিক্যের সন্ধানে। তবে প্রায় নিয়ম করেই আসতেন পুজোর সময় অশোকদার করা ঠাকুর দেখতে। আমি ওনাকে একবার দেখেছি, ওই গলির মধ্যে অশোকদার কাজ দেখতে দেখতে আড্ডা মারছেন। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুরও ছাত্র জীবনে আড্ডা মারার জায়গা ছিল মস্কো। পাশেই ওনার মাস্টারমশায়ের বাড়ি। তাঁর স্ত্রী এখন নবতিপর। বুদ্ধবাবু প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যখন কুমোরটুলিতে একটা অনুষ্ঠানে এলেন, তখন ওনার সাথে দেখা করে গেছিলেন। ওনার দু-একজন পুরনো বন্ধুর সাথেও কথা বলতে দেখেছিলাম তাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে। সিকিউরিটি গুলোর অবস্থা তখন সঙ্গীন হয়ে গেছিল। এসব একদম কাছ থেকে দেখা। আসলে ঘরাণাটাই তো উত্তর কলকাতার, তাই শিরা উপশিরায় ওই প্রোটকল বর্জনের প্রবাহ। মস্কোতে আরও একজন, এখনও আছেন। আমরা চিনি ছেঙ্কুদা বলে। ক্যারামে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। এখন চায়ের গেলাসটা, দু-হাতে ধরেন হাত কাঁপে বলে। ওনার কাছেই শোনা পাশের মাঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতের জলসার কথা। দেবব্রত বিশ্বাস আসতে চান নি প্রথমে। বলেছিলেন ওসব এলাকার লোক রবীন্দ্রসঙ্গীত কি বুঝবে ! ছেঙ্কুদা বলে এসছিলেন, আপনি যাবেন কি না সেটা আপনার পছন্দ, তবে এটা জেনে রাখুন, আমাদের এই মাঠটাকে কেন্দ্র করে যদি দেড় কিলোমিটার ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত কল্পনা করি তবে সেখান থেকেই এক সময় সারা দেশের চিন্তনের অভিমুখ নির্দ্ধারিত হত। আর রবীন্দ্রনাথের জন্ম-মৃত্যু দুই-ই সেই বৃত্তের মধ্যেই পরবে। পরে অবশ্য অশোকদা গিয়ে রাজি করিয়েছিলেন এই বলে যে, এই মাঠটা সরোজ দত্তর বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে। উনি এসেছিলেন তারপর ওই অনুষ্ঠানে। সেবছর উনিই আজকের ভাষায় যাকে বলে হায়েষ্ট পেইড- ১০০ টাকা। সরোজ দত্ত নামটা যাদের কাছে অপরিচিত ঠেকবে তাদের জন্য জানিয়ে রাখি, উনি '৭১-'৭২ এর এক ডাকসাইটে রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব।

হারান চন্দ্র ঘোষ। মস্কোর হারুদা। গর্ভমেন্ট আর্ট কলেজের প্রফেসর। সকাল বিকেল ওই মস্কোর ওই এক গজের (= ৩ ফুট) চা না খেলে মাথা দিয়ে আইডিয়া বেরোত না। উনিও ওই মাঠে ঠাকুর তৈরি করতেন। একবার অশোকদা বোধহয় পঞ্চমীর দিন, হারুদার তৈরি করা ঠাকুরের দশ-দশটা হাত পটাপট করে ভেঙে দিয়ে বলেছিলেন "এটা হাত হয়েছে!" বলে আবার নিজে নতুন করে হাত তৈরি করে লাগিয়েছিলেন। হাত নিয়ে সেই হাতাহাতি হবার পর থেকে হারুদা আর ঠাকুর করতেন না। এই টুকু পড়ে পাঠক মস্কোকে শুধু বুদ্ধিজীবীদের থুড়ি, ইন্টেলেকচুয়ালদের আখড়া ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। মস্কো আসলে দল, মত, পেশা, নেশা নির্বিশেষে একটা মত, ভাব এবং অভাব বিনিময়ের মুক্তাঞ্চল।

অমল দত্ত একটা লড়ঝড়ে স্কুটার নিয়ে মাঝে মাঝেই আসতেন চা খেতে। মস্কোয় ফুটবল বোদ্ধারও অভাব ছিল না। চুনী, পিকে, বলরাম

এসব তো ছিলই, মাঝে সাঝে পাখি সেন, ছোনে মজুমদার বা গোষ্ঠবাবুও মুখে মুখে ফিরতেন। তবে অমল দত্ত ওই ডায়মন্ড ম্যাচের পর আর সেভাবে আসেন নি। ওখানে যারা ফুটবলবিদ তারা ওঁকেও রেয়াত করত না, সে উনি বিলক্ষণ জানতেন। ডেভিড মানে উৎপল চ্যাটার্জি বাংলার রঞ্জি দলের স্পিনার, দেশের হয়েও খেলেছেন, মস্কোর নিয়মিত আড্ডাবাজ ছিল। ইদানীং আর দেখি না। ওখানেই একবার মনে আছে কাউকে বলতে শুনেছি, গ্যারফিল্ড সোবার্স ক্রিকেটটা (আসলে কমেন্ট্রিটা) বোঝেন না। মূহুর্তে এলাকা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বক্তার সাথে তক্ক করার লোক পাওয়া যায় নি।

এসব তো বিখ্যাত বা নাম জানা কৃতীদের কথা। মস্কোয় এমন অনেক আড্ডাধারী ছিল যা দেখলে প্রেমেন মিত্তির ঘনাদার স্টাইলে আরও কয়েকটা চরিত্র অনায়াসে বাজারে নামিয়ে দিতেন। ওই যাকে বলে রিয়েল থেকে রিলে। মণিলাল বাঁড়ুজ্যে তেমনি একজন ছিলেন। সরকারী চাকুরে, অবসর নেবার পর মস্কোই ঘর-বাড়ি। একটা মুদ্রা গোছের দোষ ছিল- সব কথার শেষে বলতেন 'বাঁচবি!' প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়বোধক, শ্রোতা যেমনভাবে নেবে। কিন্তু, জগৎ জীবনের এই নশ্বরতার প্রতিধ্বনি বহুদূর থেকে শ্রুতি গোচর হত। কথায় কথায় নিজেকে শান্ডিল্য গোত্র বলে পরিচয় দিয়ে বিশ্বের তাবড় দেশে ঘোরার অভিজ্ঞতা অক্লেশে বর্ণনা করতেন আমাদের মত কূপমন্ডূকদের কাছে। পরে জেনেছিলাম জীবনে একবার খালি বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও যান নি। সেকথা ওনার কানেও গেছিল। তাতে উনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে সটান চাঁদের পাহাড় রেফার করে শান্ডিল্য গোত্রের সহজাত কল্পনা শক্তির কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন - "তোর বাবা বাঁচেনি, তুই কি বাঁচবি!" শ্রোতা স্তব্ধ-বাক হওয়া ছাড়া আর কি-ই হতে পারতেন!

মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাংসারিক অনটন কখনও তার রসহানি ঘটাতে পারে নি। তেমনি এক উদাহরণ চন্ডীদা। আমরা দেখেছি অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। অভাবের সংসার। কিন্তু আনন্দের কোন অভাব ছিল না কোন দিন। পাশের বাড়ির একটা বাচ্চা ছেলে চন্ডীদা আর চন্ডীদার স্ত্রীর কোলে-পিঠেই মানুষ। এখন বড় চাকুরে নিউটাউনে থাকে। তাকে ছোটবেলায় শিখিয়েছিলেন পাখিকে বেড়াল আর বেড়ালকে পাখি বলতে। সে বেড়াল দেখলেই পাখি পাখি বলে চেঁচিয়ে উঠত। আর বেড়াল দেখলে বলত পাখি। পাঠক বাবা-মায়ের বিড়ম্বনাটা একবার কল্পনা করুন। চন্ডীদার ছেলে শিক্ষিত, কিন্তু কখনই জীবন নিয়ে সিরিয়াস ছিল না। কিছুই করত না। মাঝে মাঝে এটা সেটা করত বাবার পেনশেন বা পৈতৃক জমিজমা থেকে কখনও সখনও কিছু টাকা পাওয়া, এভাবেই কাটিয়ে দিয়ে করোণার সময় দিন সাতেক ভুগে দিব্যি কেটে পরল। কিছু না করাটাও যে আসলে কিছু করা, এটাই বোধহয় ওঁরা সারাজীবন অনুশীলন করতে চেয়েছিলেন।

কলকাতার প্রায় সব পাড়াতেই এখনও একটা করে রেজিস্টার্ড পাগল থাকে। মস্কোরও ছিল -দেবদূত। অঙ্কে এক সময় বেশ মাথা ছিল শুনেছি। ভাল দাবা খেলত। ট্রাফিক পুলিশরা মাঝে মাঝে প্রকৃতির ডাকে সারা দিয়ে কর্ম বিরতিতে গেলে ও-ই ট্রাফিক সামলাতো। আমরা চা খেতে গেলে, পাশে এসে বসে বলত একটা চা খাওয়া তো। এই দেবদূতকে একদিন দেখি সকালবেলা রাস্তার মোড়ে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকতে। আমায় দেখে বলল কিছু খাওয়া তো, কাল রাতে খাওয়া হয় নি। বেশ খান কতক কচুরি আর এক গেলাস চা খেয়ে চলে গেল। দুদিন পর শুনি রেল লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কে জানে ও হতাশ হয়ে পাগল না কি পাগলামিতেই হতাশ হয়ে পরেছিল! না কি আমারা ওকে মিছিমিছি পাগল ভেবেছিলাম।

তবে মস্কোর খানদানি পাগল- অনুপদা ভাল নাম অনুপ কুমার মুখার্জ্জী, তিনি এখন স্বমহিমায় বিরাজ করছেন। বিধাতার সাথে নিত্যদিন সাপ-লুডো খেলেন মস্কোয় বসেন আর চা খান । অসম্ভব ভাল তবলা বাজায়। নিজেদের বাড়ি ঘর সবই আছে, খাওয়া পড়ার কোন চিন্তা নেই। তবুও পাগল। ভদ্র জামা কাপড় পরে আপন মনে বিড়ি খায় আর পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়। তখন সামনে দিয়ে যে-ই যায়, তা সে নিজের পরিবারের বা পাড়ার সে-ই ওর প্রতিপক্ষ। তাকে উদ্দেশ্য করেই সাধু বা চলিত ভাষায় গাল পারে। পাগল হতে গেলে তো আর কোন কারণ লাগে না। অনুপদার মনে অনেক প্রশ্ন জমা হয়ে থাকত। কেউ একটু ভালবেসে পাশে এসে বসতে দিলে সেইসব প্রশ্ন করত। যেমন মা দুর্গা দশ হাত নিয়ে কিভাবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোন? রাবণের স্যান্ডো গেঞ্জি পরার মতই যা আজও অমীমাংসিত। খুব দুঃখ নিয়ে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, লোকে ছাগল পোষে, গরু, মোষ, কুকুর, পাখি এসব পোষে কই কেউ মানুষ পোষে না কেন! চোখের জল মোছার জায়গা পাই নি, পালানোর আগে। এ তো শুধু অনুপদার প্রশ্ন নয়, জীবন যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত প্রায় সব মানুষেরই অন্তর্জিজ্ঞাসা।

মস্কোর আরেক জন কৃতীর কথা না বললেই নয়। তিনি ডা. সন্ময় গাঙ্গুলী। হ্যাঁ, ডাক্তার। ক্যানসার নিয়ে রিসার্চ করেছেন, ডা. সরোজ গুপ্তের ছাত্র। আমরা রাণাদা বলে ডাকতাম। মস্কোর ঠিক ওপরের গাড়ি বারান্দাটা ওদেরই বাড়ির। রাণাদাকে দেখলে মনে হত ডাক্তারিটা বোধহয় পাস টাইম। রাণাদার সবচেয়ে ভাল লাগা ছিল গ্রামে গঞ্জে বা শহরতলিতে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ানো। বাড়িতে গোটা চারেক কুকুর, দুটো কাকাতুয়া, গোটা দুয়েক টিয়া একটা ম্যাকাও আর একটা বাজ পাখি ছিল। অবশ্য আমাদের মনে হত ওটা চিল। কাঁধে বসিয়ে সিগারেট কিনত দোকান থেকে, দোকানিটা দোকান ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়াতো। স-চিল রাণাদা এসে সিগারেট নিয়ে টাকা রেখে দিয়ে চলে যেত। ম্যাজিক শোতে ম্যাকাওটাকে নিয়ে যেত। ডাক্তারি করতে রাণাদাকে আমরা কখনও দেখিনি। ওই হসপিটালে যেত, ব্যাস। একদিন সকালে বাজার যেতে গিয়ে শুনি রাণাদা সুইসাইড করেছে গলায় দড়ি দিয়ে। অদ্ভুত লাগল। অমন হাসি খুশী, হুজুগে মাতা একটা লোকও এভাবে মরে যেতে পারে! কষ্ট হয় না একটুও! শুনেছিলাম পারিবারিক কিছু সমস্যা ছিল। দিন দুয়েক পর স্বপ্ন দেখলাম রাণাদা এক কাঁধে একটা বাজ আর এক কাঁধে আরেকটা কাক বসিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে দেখবি, কাক আর বাজ রেখে আমি কেমন ভ্যানিশ হয়ে যাব! আমি ম্যাক্সি ম্যাক্সি বলে চেঁচিয়ে ধরমর করে উঠে পড়েছিলাম। পরে অনেক ভেবে দেখেছিলাম ওই ম্যাক্সি আসলে ম্যাকাও, কাক আর চিলের কোন মিলিত অবতার।

এই লেখাটা লেখার কিছুদিন আগে একদিন সকালে চা খেতে মস্কো গিয়ে শুনলাম রাণাদার দাদারা বোধহয় বাড়ি বিক্রি করে দেবে, সবাই বিদেশেই সেটল, এক বৌদি আবার বিদেশিনী, ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। প্রমোটারদের সাথে কথাবার্তা চলছে। আর হয়ত মস্কোও থাকবে না। এমনিতেই ক্ষয়িষ্ণু সময়ে এখন সর্বাঙ্গে তার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। সাবেক সোভিয়েতের মতই আমাদের মস্কোও একদিন বাজারের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আসলে বাজার তো শুধু তাদেরই মনে রাখে যারা বাজারকে কব্জায় রাখতে জানে। আজ যাদের কথা বললাম, তারা কেউ-ই আদপে বাজারকে পাত্তা দেয় নি। হেরে যাওয়া জীবনকে তারা জোর খাটিয়ে জিততে চায় নি। এমন কিছু করেও নি কখনও যাতে বাজারের ওঠা পরা গায়ে না লাগে। তবু সময়ের খন্ডচিত্রের মঞ্চায়নে এরা সকলেই উজ্জ্বল কুশীলব। না হয় বাজার না-ই বা ঠাঁই দিল। কালের যাত্রাপথে আমাদের মত ছাপোষা মানুষের বর্মি বাক্সয় তারা সবাই জায়গা করে নেবে অক্লেশে। এও কি বড় কম পাওয়া?

হোক্কাইদোর উষ্ণপ্রস্রবণ অবকাশ কেন্দ্র

- কাজুহিরো ওয়াতানাবে

১৯১০সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত "জাপান প্রবাস"-এ মন্মথনাথ ঘোষ, যার আদিবাস ছিল যশোরে, লিখেছিলেন,

"এতদ্ব্যতীত জাপানীদের স্নানের ব্যবস্থা অতীব নিন্দনীয়। পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ একই টবে নগ্নাবস্থায় নামিয়া স্নান করিতেন। আজকাল সভ্যতার নবালোকে আসিয়া স্ত্রী এবং পুরুষের স্নানের স্থান পৃথক পৃথক করা হইয়াছে বটে; কিন্তু পুরুষ হউন, আর স্ত্রী হউন উলঙ্গ হইয়া এক সঙ্গে ২০/২৫জন এক ক্ষুদ্র টবের (অনেকটা চৌবাচ্চার ন্যায়) ভিতর অবগাহন করিতে ঘৃণাও বোধ হয় নাকি? মুটে, মজুর, ভদ্র, অভদ্র সকলেই একই টবের ভিতর নামিয়া গাত্র মার্জন করিয়া থাকেন। একই জলে একাধিক্রমে দু তিন শত লোক গাত্র ডুবাইয়া স্নান করিতেছেন, অথচ উহা নির্বিকারে মুখে দেওয়া হইতেছে !"

কিছু মনে করবেন না মন্মথনাথ বাবু, তবে একজন জাপানি হিসাবে আমি জাপানিদের স্নানাভ্যাস নিয়ে আপনার অভিযোগ মানতে পারলাম না। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে অনেক অনেক বাঙালি একেবারে অপরিচিত লোকদের সঙ্গে একসাথে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করতে ইতস্তত বোধ করতে পারেন, কিন্তু আমি সহ অধিকাংশ জাপানিদের ধারণা, বড় স্নানাগারে যা পারিবারিক স্নানাগারে রাখা বাথটবের কয়েকগুণ বড় চৌবাচ্চায় গরম জলে নেমে – পাশে অন্য লোক থাকুক বা নাই থাকুক- একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে দেওয়ার মত আনন্দের মুহূর্ত আর কবে কোথায় পাওয়া যায়? এবং সেটি যদি কলের জল না হয়ে ওনসেন বা উষ্ণপ্রস্রবণের জল হয় তাহলে তো আর কথাই নেই।

জাপানি একটি আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী ওনসেন বলতে বোঝায় ভূগর্ভ থেকে উঠে আসা গরম জল বা খনিজ পদার্থযুক্ত জল বা বাষ্প যার তাপমাত্রা ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসার সময় ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উর্ধ্বে হয় অথবা সেই জলে নির্দিষ্ট পদার্থগুলো মিশ্রিত থাকে।

আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসা বৃষ্টি বা তুষারের জল মাটির নিচে চলে গিয়ে ম্যাগমার তাপে উষ্ণ হলে ওনসেন-এর সৃষ্টি হয়। ম্যাগমা হল ভূগর্ভে থাকা তাপযুক্ত গলিত বা আধা গলিত শিলা। জাপানের ভূপৃষ্ঠের অনেক গভীর তলদেশে রয়েছে ডজন খানেক টেকটোনিক প্লেট যেগুলো সচরাচর নড়তে থাকে আর একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। প্লেটগুলোর ঘর্ষণের ফলে অত্যন্ত উচ্চ তাপের সৃষ্টি হয় এবং তাতে পাথরগুলো গলে গিয়ে ম্যাগমার জন্ম হয়। এই ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের কোনো ফাটল বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূগর্ভ থেকে নির্গত হলে সেই তরল পদার্থকে বলা হয় লাভা। প্লেটগুলোর সংঘর্ষের ফলে মাঝেমাঝে বড় মাপের ভূমিকম্পও ঘটে যায়।

জাপানি ভূখণ্ডের আশেপাশে বেশ কয়েকটা প্লেটের অস্তিত্বের কারণে জাপানে প্রচুর আগ্নেয়গিরির অবস্থান, সেই সঙ্গে অনেক ওনসেন উষ্ণপ্রস্রবণও এদেশে পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠের নিচে জমে থাকা জল ম্যাগমার দ্বারা তাপযুক্ত হওয়ার সময় গলিত পাথর থেকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ জলে মিশে যায় যেগুলো নাকি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

সারা জাপানে তিন হাজারের মত উষ্ণপ্রস্রবণ অবকাশ কেন্দ্র রয়েছে যেখানে উষ্ণ ঝরনায় স্নানের ব্যবস্থা এবং থাকার হোটেল পাওয়া যায়। জাপানের ৪৭টি জেলার মধ্যে উত্তরস্থ হোক্কাইদোতে, যেখানে আমি এখন বসবাস করছি, সেই জেলায় সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় উষ্ণপ্রস্রবণ অবকাশ কেন্দ্র রয়েছে। হোক্কাইদোতে এমন জায়গার সংখ্যা প্রায় ২৫০। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উষ্ণপ্রস্রবণ কেন্দ্রের নাম বলতে যদি বলা হয়, অনেকেই নোবোরিবেৎসুর নাম উল্লেখ করবে। গত বছর নভেম্বর মাসে স্ত্রীর সঙ্গে এই নোবোরিবেৎসু যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার।

হোক্কাইদো জেলার রাজধানী সাপ্পোরো। আমাদের সেই সাপ্পোরোর বাড়ি থেকে মোটরগাড়িতে করে নোবোরিবেৎসু যেতে লাগে আড়াই ঘণ্টার মত। টোল দিয়ে এক্সপ্রেসওয়ে ধরলে আরও কম সময় লাগবে, কিন্তু দুবছর আগে হোক্কাইদোতে বাড়ি বদল করে চলে আসার পর জানতে পেরেছি, হোক্কাইদোর স্থানীয় বাসিন্দারা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে তেমন যাওয়াআসা করেন না। এর কারণ এখানকার রাস্তাগুলোতে সাধারণত গাড়ির চলাচল কম থাকাতে বেশ স্পীডে গাড়ি চালানো সম্ভব, তাই এক্সপ্রেসওয়ের টোলের জন্য অতিরিক্ত খরচ করতে তারা রাজি নন। যস্মিন দেশে যদাচার। আমিও এক্সপ্রেসওয়েতে না ওঠার সিদ্ধান্ত নিই। সাপ্পোরোতে ২০ লাখ মানুষের বাস। অফিস-কাছারির সংখ্যাও কম নয়। স্বভাবতই শহরটির কেন্দ্র ভাগে অনেক গাড়ি। সেখানে মাঝেমাঝে যানজটেরও সৃষ্টি হয়। তবে বড় জোর আধ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে শহরটির উপকণ্ঠে পৌঁছলে পথের দুধার থেকে লোকবসতি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সেখানে শুধু খোলা মাঠ ও বনাঞ্চলের বিস্তার। হোক্কাইদোর রাস্তা চওড়া ও সোজা। সেই রাস্তা আবার ফাঁকা হয়ে যায়। যত দূর দেখা যায়, আমার গাড়ির সামনে ও পিছনে অন্য কোনো গাড়ি চোখে পড়ে না, এমন অবস্থা বিরল নয়। তখন একটু বেশি মাত্রায় গতি সঞ্চার করতে চেয়েছে বলে গাড়িকে দোষ দেবেন কী করে?

যাই হোক। নোবোরিবেৎসু নামের উৎপত্তি নাকি জাপানের আদিবাসী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আইনুদের ভাষা থেকে। আইনু ভাষায় নুপুরপেত মানে 'অস্বচ্ছ নদী'। সালফার বা গন্ধক সহ নানান খনিজ পদার্থ মিশে যাওয়াতে জল সাদা রঙ ধরার কারণে আইনুরা বর্তমান নোবোরিবেৎসু শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদীটিকে এই নামে ডাকতেন। পরবর্তীতে অভিবাসনের জন্য এখানে আসা জাপানিরা নুপুরপেতকে রূপান্তরিত করে নোবোরিবেৎসু নামে এই এলাকাটিকে ডাকতে শুরু করেন।

কথিত আছে যে আইনুরা অতীতকাল থেকে ওনসেনের জলে স্নান করতেন। তবে আধুনিক উষ্ণপ্রস্রবণ কেন্দ্র হিসাবে নোবোরিবেৎসুর যাত্রা শুরু হয় ১৮৫৮ সালে, যখন একজন জাপানি মিস্ত্রি এই জায়গায় স্নানাগার সহ একটা কুটির তৈরি করলেন। তিনি টোকিও থেকে হোক্কাইদো এসে ভবন নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তার স্ত্রী ত্বকের দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন। স্থানীয়দের মুখে এখানকার গরম জলের উপকারিতার কথা শোনার পর তিনি স্ত্রীর জন্য উষ্ণপ্রস্রবণের সন্ধান করতে উদ্যত হন। নোবোরিবেৎসুর ঘন জঙ্গল কেটে এগিয়ে যাওয়া কোনো মতেই সহজ কাজ ছিল না। এছাড়া এখানকার জঙ্গলে হিংস্র ভালুকের বাস। কিন্তু তিনি দৃঢ় মন নিয়ে ও ধৈর্য্য ধরে এগোতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত উষ্ণ ঝরনা আবিষ্কার করেন। সেই জলে স্নান করে তার স্ত্রী দীর্ঘস্থায়ী রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে যান। এই কাহিনি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লে নোবোরিবেৎসু-তে স্নান করতে আসা লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

বর্তমানে নোবোরিবেৎসু-র জনসংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার। মোটামুটি বড় শহর বলা চলে। নোবোরিবেৎসুতে পৌঁছে আমরা প্রথমে শহরটির কেন্দ্র ভাগ থেকে খানিক দূরে অবস্থিত ওওইউনুমা হ্রদ দেখতে গিয়েছিলাম। এই বেশ বড় জলাশয়ের তলদেশ থেকে নাকি ১৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের সালফার যুক্ত জল ফুটে আসছে। জলের রঙ ধূসরাভ সাদা। জলের উপর অনবরত বাষ্প উঠছে। কোনো কোনো জায়গায় বুদবুদগুলো টগবগ করছে। অত্যন্ত গরম হওয়াতে এই হ্রদের জলে স্নান করা একেবারে অসম্ভব, তবে হ্রদ থেকে বেরিয়ে যে একটি নদী শহরের কেন্দ্র ভাগের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তার এক অংশে ঘাটের মত জায়গা তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে বসে নদীর জলে পায়ের নিম্নাংশ ডুবিয়ে 'আশি-ইউ' বা পায়ের স্নান উপভোগ করা যায়।

নোবোরিবেৎসুতে পর্যটকের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় স্থানের নাম জিগোকুদানি, মানে নরক-উপত্যকা। এটা আসলে আগ্নেয়গিরির পুরনো জ্বালামুখ, যার ব্যাস প্রায় ৪৫০ মিটার। নোবোরিবেৎসু এলাকায় প্রতি মিনিটে তিন হাজার লিটারের ওনসেনের জল পাওয়া যায়, এবং তার মুখ্য ঝরনাগুলি এই জিগোকুদানিতে অবস্থিত। এই উপত্যকার আনাচেকানাচে মাটির নিচে থেকে উত্তপ্ত জল ও বাষ্প জোরে জোরে ফুটে আসতে দেখা যায়। কোনো কোনো জায়গায় বিপদজনক বিষাক্ত গ্যাসও নাকি নির্গত হচ্ছে। উপত্যকা জুড়ে রয়েছে লালচে বাদামি রঙের শিলাগুলো, সালফার যুক্ত মাটির রঙ হলুদাভ সাদা। তাপ ও গ্যাসের কারণে এই এলাকায় কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ টিকে থাকতে পারে না। এই ভয়ংকর দৃশ্য থেকে নরক-উপত্যকার নামকরণ করা হয়েছে বলে কথিত। নরক মানে হল তার রাজা যমের বাসস্থান। যমকে জাপানি ভাষায় বলা হয় 'এম্মা'। বলাই বাহুল্য, নামটির উৎপত্তি সংস্কৃত বা পালি ভাষা থেকে। নোবোরিবেৎসুর কেন্দ্র স্থলে উচ্চতায় ৫ মিটারেরও বেশি যমের মূর্তি বসানো হয়েছে। এই যম দেবতা সাধারণতো শান্তশিষ্ট চেহারা নিয়ে বসে থাকলেও তার মুখ মাঝেমাঝে হঠাৎ ক্রোধাগ্নিতে ভীতিকর হয়ে উঠে পর্যটকদের আতঙ্কিত করে তোলে।

জাপানের বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যায় এম্মা বা যমের অনুসারী দৈত্যদানব যাদের গায়ের রঙ নীল বা লাল। নোবোরিবেৎসুর এখানে সেখানে এই দানবদের মূর্তিরও দেখা মেলে।

আমরা যে হোটেলে উঠেছিলাম, তার ৮ তলার ভবনের সর্বোচ্চ তলায় স্নানাগার তৈরি করা হয়েছে। নোবোরিবেৎসুতে বিচিত্র ধরনের ওনসেনের জল পাওয়া যায়। এই হোটেলের ওনসেনের জলে সামান্য সালফারের গন্ধ। জলের রঙ প্রায় স্বচ্ছ। বাথটবে গা ডোবালে সামনের বিশাল কাঁচের জানালার ওপাশে শরতের রঙ্গে রঞ্জিত গাছপালার বিস্তার। সত্যিই সুন্দর দৃশ্য। এই হোটেলে ঝরনা থেকে নিয়ে আসা হয় প্রাকৃতিক সালফার, সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম যুক্ত ৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের জল, যার তাপমাত্রা স্নানের উপযোগী করে তোলার জন্য ৪১-৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নামিয়ে স্নানাগারে দেওয়া হচ্ছে। এই জল নাকি ত্বকের রোগ ও ত্বকের ক্ষত সারাতে উপকারী হয়। তবে উপকারিতা সম্বন্ধে যাই আলোচনা হোক না কেন, ওনসেনের সব থেকে বড় কার্যকারিতা ও আকর্ষণ হল গরম জলে ঘাড় পর্যন্ত গা ডুবিয়ে বাইরের মনোরম দৃশ্য দেখে মনের যে শান্তি উপলব্ধি করা যায়, সেটাই। উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান এত উপভোগ করেছিলাম যে স্নানাগার থেকে বেরোতে দেরি করেছি বলে স্ত্রীর বকুনি খেতে হল।

করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার আগে নোবোরিবেৎসুতে দেশের ভিতর ও বাইরে থেকে বার্ষিক ৪০ লক্ষ পর্যটকের আগমন হত। তাদের মধ্যে প্রায় ৫ লাখ চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলি ও যুক্তরাষ্ট্রের মত বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পর্যটকরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এখানে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। নোবোরিবেৎসু ও তার আশেপাশে ছোটবড় মিলিয়ে ২০টির মত হোটেল। ৪০ লাখ আগমনকারীদের মধ্যে ১৩ লক্ষ লোক অন্তত এক রাত কাটিয়ে যেতেন এইসব হোটেলে। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে পর্যটকের আগমনে ব্যাপক ভাটা পড়ে যায়। বিশেষ করে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। তবে আমরা যেদিন গিয়েছিলাম, ততদিনে করোনার বিস্তার রোধের জন্য আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অনেকটা শিথিল করা হয়েছিল এবং অনেক পর্যটককে নোবোরিবেৎসুতে ছুটি উপভোগ করতে দেখতে পেলাম। নোবোরিবেৎসু ভবিষ্যতেও হোক্কাইদো ভ্রমণকারীদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্যের মর্যাদা রক্ষা করে যেতে পারবে বলে আমার মনে হয়েছে।

তবে হোক্কাইদোর সব উষ্ণপ্রস্রবণ অবকাশ কেন্দ্র যে নোবোরিবেৎসুর মত সমানভাবে জনপ্রিয় বা রমরমা অবস্থায় রয়েছে, তা কিন্তু নয়। একসময় খুব প্রসিদ্ধ হলেও বর্তমানে অতীতের সমৃদ্ধি হারিয়েছে এমন বেশ কয়েকটি ওনসেন কেন্দ্র রয়েছে।

একদিন হোক্কাইদোর পূর্বাঞ্চলের উষ্ণপ্রস্রবণ কেন্দ্র কাওয়াইউ-তে গিয়েছিলাম ছুটি কাটাতে। এবার গাড়িতে নয়, ট্রেনে। হোক্কাইদোতে মোটরগাড়ির তুলনায় ট্রেন ভ্রমণ তেমন সুবিধাজনক নয়, কারণ মফস্বল এলাকায় ট্রেনের চলাচল কম হওয়ায় কোনো কোনো সময় ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অনেক সময় চলে যায়। তবু ট্রেনের জানালা থেকে দেখা দৃশ্য সত্যিই দৃষ্টিনন্দন। ট্রেন যত এগোতে থাকে, জানালার বাইরে পরের পর দৃশ্যমান হয় বিশাল সমুদ্র, ঘন ঘন বনজঙ্গল ও বিস্তৃত সবুজ মাঠ এবং মাঠে গরু, ঘোড়া এমনকি মাঝেমাঝে হরিণদের ঘুরে বেড়াতে ও ঘাস খেতে দেখা যায়...জাপানের অন্যান্য অঞ্চলে এরকম দৃশ্য পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। উপরন্তু ট্রেনের বিশেষ টিকিট সস্তা মূল্যে কাটতে পেরেছিলাম – এত সস্তা যে সাধারণ দামের অর্ধেকেরও কম খরচে গন্তব্যে যাওয়া-আসা করা যায়।

সাপ্পোরো থেকে সাত সকালে যাত্রা শুরু করে কাওয়াইউ ওনসেন স্টেশনে যেতে ট্রেন বদল করে ৭ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল। স্টেশন থেকে বাসে করে যখন কাওয়াইউ-র হোটেলে পৌঁছেছি, ততক্ষণে বিকেল হয়ে গিয়েছে। অবশ্য ডিনারের সময় তখনও হয়ে নি বলে ঠিক করলাম হোটেলের চারপাশে ঘুরে দেখব। কাওয়াইউ ওনসেন এমনিতেই ছোট জায়গা, চক্কর মারতে বেশি সময় লাগে না। এখানে আসার আগে শুনছিলাম যে একদা ওনসেন কেন্দ্র হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করলেও এত দিনে কাওয়াইউ ওনসেনের জনপ্রিয়তার ব্যাপক অবনতি হয়েছে। দেখলাম, কথাটা সত্য। রাস্তার দুধারে বেশ কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া হোটেলগুলো দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলো ব্যবসার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ হওয়ার পর রক্ষণাবেক্ষণের অনুপস্থিতিতে হোটেল ভবনগুলির বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে। দালানকোঠার নিচের জমি আগাছায় কানায় কানায় ভর্তি।

১৯৯০ দশকের প্রথমার্ধে কাওয়াইউ উষ্ণপ্রস্রবণ অবকাশ কেন্দ্র ছিল তার সমৃদ্ধির তুঙ্গে। সেই সময় এখানে মোট ২০টি হোটেল ছিল এবং বছরে ৫ লাখ ৬০ হাজার পর্যটক সেইসব হোটেলের অতিথি হয়ে রাত্রিযাপন করে যেত। কিন্তু এখন মাত্র ৪টে হোটেল কোনো মতে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯০ দশকে জাপানের অর্থনৈতিক মন্দার সময় গ্রুপ ট্যুরে আসা পর্যটক হ্রাসের প্রবণতা ঠেকাতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে না পারার ফলে এই দশা হয়েছে।

কেবল হোটেল নয়, অধিকাংশ পানশালা এবং খাবারের দোকানের দরজাতেও তালা লাগানো হয়েছে। কিছু সুভেনির দোকান খোলা আছে, কিন্তু খদ্দের নিতান্তই কম। সব সুভেনির দোকানে একটা জিনিস বিক্রি করা হচ্ছে—হরিণের শিং। হোক্কাইদোতে জাপানি হরিণের উপপ্রজাতি 'এযোশিকা'-র বাস। একসময় তাদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল, তবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংরক্ষণের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে তারা ধ্বংসের মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হোক্কাইদোর গ্রামাঞ্চলে শুধু বনজঙ্গলে নয়, বরং লোক বসতিতে হরিণকে দেখতে পারা বিরল ঘটনা নয়। কাওয়াইউ ওনসেন স্টেশনে পৌঁছাবার আগে এক জায়গায় এসে আমাদের ট্রেন হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। একটা হরিণ রেলপথে প্রবেশ করেছে দেখে ধাক্কার বিপদ এড়াবার জন্য ট্রেনের চালক ব্রেক কষে গাড়িটাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। আসলে ট্রেন ও মোটরগাড়িতে চাপা পড়ে হরিণ মরে যাওয়ার ঘটনা হোক্কাইদোতে সচরাচর ঘটছে। এছাড়া কোনো কোনো জায়গায় হরিণরা খেতের ফসল খেয়ে ফেলে বলে অনুমতি প্রাপ্ত শিকারিদের হাতে তাদের সংখ্যা কমানোর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। পুরুষ হরিণের শৃঙ্গ প্রত্যেক বছর পড়ে গিয়ে আবার নতুন করে গজিয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা এসব পড়ে থাকা শৃঙ্গ জঙ্গল থেকে তুলে এনে অথবা শিকারিদের কাছ থেকে নিয়ে সেগুলো পালিশ করে কিংবা কী হোল্ডার, স্ট্র্যাপ, কানের দুলসহ ছোটখাটো অলংকারের জিনিস বানিয়ে সুভেনির দোকানে বিক্রি করে থাকেন। কিন্তু আমার সন্দেহ হল, কী হোল্ডার ও কানের দুল এগুলো ঠিক আছে, তবে আস্ত হরিণ শিং কিনতে চাইবে কারা?

সুতরাং কাওয়াইউ ওনসেন এলাকা নিয়ে আমার প্রাথমিক ধারণা তেমন ইতিবাচক হতে পারে নি। কিন্তু এই ধারণা একেবারে পালটে যায় হোটেলে ফিরে গিয়ে সেখানকার স্নানাগারে একবার গা ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে। অসাধারণ উষ্ণপ্রস্রবণের জল! যেন অসংখ্য ছুঁচ দিয়ে সারা গায়ে হাল্কা খোঁচা মারা হচ্ছে, এমন অভূতপূর্ব আনন্দদায়ক অনুভূতি! এক কথায় চমৎকার!

এই উষ্ণপ্রস্রবণ কেন্দ্রের অদূরে একটি আগ্নেয়গিরি। এই পর্বতে আগে সালফারের খনি ছিল। এখনো পর্বতটির গা থেকে সালফারযুক্ত গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এই সালফারের কারণে গোটা এলাকার জল উচ্চ মাত্রার অম্লতা ধারণ করে। অম্লতার প্রভাবে এখানকার উষ্ণপ্রস্রবণের জলে ডোবালে লোহার পেরেক নাকি ২ সপ্তাহের মাথায় একেবারে গলে যায়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোতেও তাড়াতাড়ি মরচে ধরে যায় বলে ওয়াশিং মেশিন ও রেফ্রিজারেটরের মত জিনিস ঘনঘন নতুন কিনতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তবে স্নানের ক্ষেত্রে এই অম্লযুক্ত জলের উপকারিতা বেশি। এই জলে স্নান করলে জীবাণুমুক্ত হওয়া যায় এবং ত্বকের ক্ষত দ্রুত সেরে যায়। আবার হাই ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবেটিসের মত দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসার জন্যও সহায়ক এখানকার উষ্ণ ঝরনার জল। এখানকার ওনসেনের এত গুণাবলি এবং স্নানের সময় সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি অনেক পর্যটককে মনের তৃপ্তি দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

ওনসেন ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে একদিন খবরের কাগজে পড়লাম, জাপানের এক বিখ্যাত হোটেল চেইন কাওয়াইউতে বন্ধ হয়ে যাওয়া হোটেলের জমি ক্রয় করে সেখানে একটা আধুনিক রিসোর্ট হোটেল নির্মাণ করবে। এই হোটেল চেইন এর আগে জাপানের নানান অঞ্চলে একই পদ্ধতিতে নতুন হোটেল খুলে ভাল মুনাফা অর্জনের সাথে সাথে স্থানীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং এই হোটেল চেইনের উপর কাওয়াইউ ওনসেন এলাকার লোকেদের প্রত্যাশা বেশি। খবরটা পড়ে আমিও কৌতূহলী হলাম। ভাবলাম, কাওয়াইউ উষ্ণপ্রস্রবণ অবকাশ কেন্দ্রের সার্বিক চেহারার যখন উন্নতি হবে, তখন ঐ অপূর্ব ওনসেনের জল উপভোগ করতে আবার ওখানে গেলে মন্দ হবে না।

কৌতুকপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ

- ভাস্বতী সেনগুপ্ত ঘোষ

কবিগুরুর লেখা বই অথবা কবিগুরুর প্রসঙ্গে লেখা গুণীজনের বই আমাকে নিবিষ্ট করে রাখে। যতবারই পড়ি সেইসব বই ছাড়তে ইচ্ছে করেনা, ছাড়তে কষ্ট হয়। বর্তমান প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতিতে, যখন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বিপর্যস্ত, তখন এই প্রাত্যহিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও সঙ্কটের উর্ধে মনকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভারমুক্ত করা ও আনন্দ দেওয়া – এই লেখার প্রেরণা। আমার মত অসংখ্য রবীন্দ্র অনুরাগী ও বাংলা পাঠক-পাঠিকা, সাহিত্যপ্রেমী নিশ্চয়ই এটি অনুধাবন করতে পারবেন। কবিগুরুর কৌতুকপ্রিয়তা সম্বন্ধে সব ঘটনা এখানে লেখা অসম্ভব, তাই সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি ও আশা রাখি এই লেখা পাঠকদের আমারই মত আনন্দ দেবে।

"(অভিজিৎ) সে গুরুদেব-দাদুকে বাইরে দেখেই ছুটে এল, এসেই দাদুর গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল, বললে, জানো দাদু, তোমার সব কবিতা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি, আর একটাও বাকি নেই।

গুরুদেব বললেন, সত্যি নাকি? সব শিখে ফেলেছ? – হ্যাঁ দাদু। স---ব। তা হলে তো তোমার জন্য আবার আমার নতুন করে কবিতা লিখতে হবে দেখছি। গুরুদেব ও অভিজিতের কথা জমে উঠল। উচ্ছ্বাসের ধাক্কায় অভিজিৎ ডান হাঁটুটা গুরুদেবের কোলের উপর তুলে দিয়েছে কখন, বলছে, জানো দাদু, আজ কোন কবিতাটা শিখেছি? শোনো –

"পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী শিখের দল – সুহিদগঞ্জ রক্তবরন হইল ধরণীতল।"

কবিতার মধ্যে "পাঠা" আর "রক্ত" এই দুটোই বুঝেছিল সে। তাই বললে, এর মানে কি জানো দাদু? গুরুদেব মাথা নাড়লেন। অভিজিৎ গুরুদেবের মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাতে শুরু করে দিল, এর মানে হল – পাঁঠাগুলিকে বেঁধে নিয়ে এল – কাটল, আর রক্ত-রক্ত বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানি যতটা পারল সামনে বাড়িয়ে দিল। দু-চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। ভাবখানা-যেন অতি বিস্ময়কর একটা ব্যাপার দেখাচ্ছে সে তার গুরুদেব দাদুকে। গুরুদেব প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। বললেন, তাই তো গো, এমন মানে তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জানে না গো।

(গুরুদেব- শ্রীমতী রানি চন্দ, পৃষ্ঠা-১৪০, ১৪১)

সুরেন্দ্রনাথের দুই মেয়ে মঞ্জুশ্রী ও জয়শ্রী। জয়শ্রী নির্বাচন করেছিলেন কুলপ্রসাদ সেনকে। অসবর্ণ বিবাহ বলে পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী আপত্তি উঠেছিল, ব্রাহ্মণে-অব্রাহ্মণে বিয়েতে মহর্ষির প্রবল আপত্তি ছিল। এই বিবাহে পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অসবর্ণ বিয়ে হলেও রেজিস্ট্রি করা হয়নি। আচার্যের কাজ করলেও কবি তখন এই বিয়ে উপলক্ষে কোনও কবিতা লেখেননি। এলাহাবাদে জয়শ্রী কবিকে অনুরোধ জানালেন একটি কবিতা লিখে দিতে। কবিও লিখলেন –

"তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক সিঁদুরের কৌটা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে।
শাশুড়ি না বলে যেন, কি বেহায়া বৌটা...।
(ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল-শ্রীমতী চিত্রা দেব, পৃষ্ঠা-১৬৩)

এবার আসি অন্য ঘটনায়। কবিগুরু যে মংপু খুব ভালবাসতেন ও মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন সেটা সর্বজনবিদিত। মংপুর কমলাবনের উৎকৃষ্ট মধু ও শীতকালে কমলালেবু কবির প্রিয় ছিল। লেবুগুলি পাঠভবনের ছেলেদের ডেকে খাওয়াতেন।

১৩ ফাল্গুন ১৩৪৬ উত্তরায়ণ শান্তিনিকেতন

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মউচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পারো ডাকে
বিলাতী শুগার হতে পাব নিস্তার,
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।
মধুর অভাব যবে অন্তরে বাজে
গুড়ং দদাৎ বাণী বলে কবিরাজে।
দায়ে পড়ে তাই
লুচি পাউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই,--
বিমর্ষ মুখে বলি গুড়ং দদাৎ
সে যেন গদ্যের দেশে আসি পদাৎ।

খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিত্ত
নিঃশ্বাস ফেলে বলে সকলি অনিত্য।
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হতে তোমার আতিথ্য
গৌড়ী গদ্য হতে পদ্যময় পদ্য
দর্শন দিতে পারে সদ্য ।।

ইতি -
রবীন্দ্রনাথ

মৈত্রেয়ী দেবীর কন্যাকে লেখা চিঠি ...

মিঠুয়া... (মৈত্রেয়ী দেবীর যত্নাধীনে)
মিঠুয়া
দাদুরে যে মনে করে লিখেছ এ চিঠি
তাই ভাবি দাদুতেও আছে কিছু মিঠি।

শান্তিনিকেতন ১৭/৩/৪০

সেটা কি অহৈতুকি প্রীতি অথবা চকোলেটের স্মৃতি?
এ কথাটা সংসারে নয় খুব সোজা
হয়তো বছর কয় যাবে নাকো বোঝা
তবু যদি লিখে রাখি তাতে ক্ষতি নেই
সংক্ষেপে এই
ভিতরে এনেছ তুমি বিধাতার চিনি
আমি সে বাহির হতে বাজারেতে কিনি –

দাদু (শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(স্বর্গের কাছাকাছি – শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী -- পৃষ্ঠা ২৬১, ২৬২, ২৬৩)

আবার আসি শ্রীমতী রানী চন্দের কথায় ...

"সহজ হৈ চৈ তাঁকে (গুরুদেবকে) বড়ো আনন্দ দিত। এক বর্ষায় বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল হচ্ছে উদয়নের পশ্চিম-বারান্দায়। নাচগানে প্রতি সন্ধ্যা জমে ওঠে সেখানে...

গুরুদেব বললেন, বর্ষামঙ্গলটা হয়ে যাক, তারপরেই আমরা করব ভরসামঙ্গল। পরদিনই ভরসামঙ্গলের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। ...আমরাও জড়ো হই জনকয়েক মিলে মজা দেখতে। গুরুদেবকে এসে পরে বর্ণনা দিই। শুনে গুরুদেবও হাসেন। বলেন, আমিও একটা গান লিখে দেব ওদের জন্য-

পরদিন আরো দুটো গান লিখলেন –

"ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ,
তিনটে – চারটে পাস করেছি, নই নিতান্ত মুকখ।
তুচ্ছ সা-রে-গা-মায় আমায় গলদঘর্ম ঘামায়,
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম –
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে, এই বড়ো মোর দুঃখ।।

আর...
পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে।

(গুরুদেব – শ্রীমতী রানী চন্দ -পৃষ্ঠা ৬২, ৬৩)

তখনকার দিনে দার্জিলিং যাওয়া আজকের মতো সহজ ছিলনা। সেইযাত্রার এক চলমান ছবি ইন্দিরা দেবীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি...

দার্জিলিং, সেপ্টেম্বর ১৮৮৭

"সারা ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা –জিনিসপত্র সহস্র, কুলি গোটাকয়েক, মেয়েমানুষ পাঁচটা এবং পুরুষমানুষ একটিমাত্র, নদী পেরিয়ে একটা ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল-তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা (মাখন-সুদ্ধ) ছটা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিসপত্র Ladies compartment এ তোলা গেল-কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপে হল কাজে ঠিক তেমনটা হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি-তবু নদিদি বললেন আমি কিছুই করিনি। অর্থাৎ, আমার মত ডাগর পুরুষমানুষের পক্ষে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল, মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে নেবে হিন্দুস্তানি বুলিতে প্ল্যাটফর্ম-ময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল। অর্থাৎ, একখানা আস্তমানুষ একেবারে আস্ত রকম ক্ষেপলে যে রকমটা হয় সেই প্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষমানুষের উপযুক্ত হত। আমার ঠাণ্ডা ভাব দেখে নদিদি নিতান্ত disappointed। কিন্তু এই দু দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে, কেবলই বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারি, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের-নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা- তখন আমার শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়- অতএব আমার সম্বন্ধে নদিদির যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক- আমি বিবিধ-বিচিত্র-মূর্তি বাক্সের মধ্যে পড়ে কী এক রকম হয়ে গিয়েছিলাম। সুরেনকে বলিস আমার এই অবস্থার একটি ছবি আঁকতে। যাক। তার পরে আমি আর একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম।"

.....সেপ্টেম্বর ১৮৮৭, ছিন্নপত্রাবলী

নিজেকে নিয়ে সরস ঠাট্টা – মোটেও সহজ নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কী অবলীলায় তা করতে পারেন, এটা তারই এক উদাহরণ। ঠাকুরবাড়ির এক ঝাঁক মহিলার সঙ্গে এসকর্ট রুপে চলেছেন ছাব্বিশ বছরের যুবক, রবীন্দ্রনাথ। ভাদ্রের পচা গরম থেকে কিছুকালের জন্য নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় দার্জিলিং যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল।

কবিগুরুকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে গবেষণা ও প্রকাশনা হয় এবং হয়ে চলবে কারণ উনি নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। বাংলায় কবিগুরুর মতই বহু মনিষী ও মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যুগের পর যুগ তাঁরা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, বাংলা তথা ভারত তাই গর্বিত ও ধন্য। কবিগুরুকে ও সকল মহামানবকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রনাম জানাই।

গ্রন্থ ঋণ ..... গুরুদেব – শ্রীমতী রানী চন্দ
স্বর্গের কাছাকাছি – শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী
ছিন্নপত্র – শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ধ্রুবপদ – বার্ষিক সংকলন – শ্রী সুধীর চক্রবর্তী

ফিরে দেখা...রূপকথা

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

২০১০ এর ৩১শে জুলাই। টোকিও পৌঁছে গেলাম। হাসি হাসি মুখ, চকচকে চোখ...একটা ঘরে কয়েকটা বাচ্চা। কিছুক্ষনের মধ্যেই দরজা বন্ধ হোল। মা বাবারা বাইরে আর আমি বাচ্চাদের নিয়ে ভিতরে.....সেই পথ চলা শুরু। Indian Classical Dance Troupe টোকিও/কাওয়াসাকির যাত্রা শুরু সেদিন থেকেই।

যে কোনও প্রতিষ্ঠান শুরুরই একটা কারণ থাকে। অর্থাৎ কেন শুরু বা কিভাবে শুরু ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা ছিলনা। আজ লিখতে বসে আজুমা সেনসেইয়ের কথা খুব মনে পড়ছে। আজুমা সেনসেই প্রতিবছর রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করতেন ইন্ডিয়ান এমব্যাসির ছোট একটা ঘরে। আসলে তখন এমব্যাসির এমন ঝা চকচকে বিল্ডিং বা এত সুন্দর হল ছিলনা। রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন ধার্য হলেই আমাকে ফোন করতেন অংশগ্রহণ করার জন্য। এমব্যাসির ওয়ার্কিং আওয়ার শেষ হবার পর অনুষ্ঠান শুরু হোত, তাই অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত হয়ে যেত। অনুষ্ঠান শেষে এত রাতে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরত্বে টয়োটা শহরে ফিরি কিভাবে? টোকিও থেকে নাগোয়ার শিনকানসেন থাকলেও নাগোয়া থেকে টয়োটা যাবার ট্রেন অতরাতে কোথায়? অগত্যা রাতের বাস ধরে পরদিন ভোর ভোর বাড়ি পৌঁছতাম। কাউকে বিরক্ত না করে, নিজে টয়োটা থেকে টোকিয়ো যাওয়া এবং ফিরে আসা। এও এক বিরাট শিক্ষা হয়েছিল তখন। এটা লিখছি কারণ টোকিয়োর বন্ধুমহল থেকে নাচ শেখানোর অনুরোধ আসছিল ঠিকই, কিন্তু অত দূরে গিয়ে নাচ শেখানো ...বাড়ি থেকে এতটা দূরে গিয়ে এই দায়িত্বটা সত্যিই নিতে পারবো তো? কারুর উপর নির্ভর করে নয়, কোনকিছু শেখানো মানেই দায়িত্ব নেওয়া আর সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। নিজের স্বভাব আমি জানি। শুরু করলাম তারপর কয়েকদিন ক্লাস করার পর "এত দূর থেকে অসুবিধে হচ্ছে তাই ছেড়ে দেবো" টাইপের কথা আমার মনে বা মুখে আসবেনা, আমি জানি। তাই একটু দোনামনা আরকি। তাছাড়া টাইফুন, বরফ ইত্যাদি প্রাকৃতিক প্রতিকুলতার কথাও ভেবেছি বারবার। সাতপাঁচ ভেবে অবশেষে ঠিক করলাম আমাকে যেতে হবে।

অবশেষে শুরু হোল। আড়াই, তিন, চার বড়জোড় পাঁচ...এই হোল বাচ্চাদের বয়স। ডান বললে বাঁ করে, সামনে এগোতে বললে পিছিয়ে যায়, একটু জোরে কথা বললেই চোখভর্তি জল... এমনই কতশত অভিজ্ঞতা জমতে থাকে আমার ঝুলিতে। শেখানো মানে নিজেরও শেখা। বিয়ের আগে মমদির (মমতাশঙ্কর) স্কুল উদয়নে নাচ শেখাতাম। তাই বাচ্চাদের শেখানো প্রথম নয়। ওদের ভাললাগা,পছন্দ ইত্যাদি বুঝতে হয়। জোরে কথা তখনই বলা যায় যখন এক বুক ভালবাসা থাকে ছোটছোট ফুলের মত বাচ্চাগুলোর প্রতি। হৈ হৈ করে চলতে থাকে আমাদের ক্লাস। তারমধ্যে ২০১১ 'র ৎসুনামির ধাক্কা এলো। অনেকেই ফিরে গেল দেশে। কিন্তু আমার যাওয়া থামেনি টোকিওতে। মুষ্টিমেয় যারা রয়ে গেল তাদের জন্য ক্লাস চলেছে রুটিনমাফিক। একটু সময় লাগলেও আবার আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়েছে। এরমধ্যে বড়দের ক্লাসও শুরু হয়। ছোটবড় মিলে জমজমাট ফ্যামিলি আমাদের।

ছোট থেকে ভারতনাট্যম এবং কনটেম্পোরারী (উদয়শঙ্কর স্টাইল) শিখে বড় হয়েছি। "আগে ঠিকভাবে শেখো, অনুষ্ঠান করার সুযোগ অনেক আসবে" গুরুদের এই কথা মেনে চলেছি সবসময়। বাচ্চারা নাচ শিখতে শিখতে বড় হচ্ছে। বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে সবসময় নয়, মাঝেমধ্যে অংশগ্রহণ করছে। দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নাচ করাটাও মাস্ট। দূরত্বের জন্য আমি সবসময় উপস্থিত থাকতে পারিনা। ফলে স্টেজে ওঠার ভয়টা কাটতে খুব একটা সময় লাগেনি।

কোলকাতায় থাকাকালীন বিভিন্ন নাচের ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছি আরও জানার জন্য। মোহিনীআট্টম,পুরুলিয়ার ছৌ, মার্শাল আর্ট ইত্যাদির ওয়ার্কশপ করেছি বেশ কয়েকবার। বিভিন্ন শিল্পীর নাচ দেখেছি। এও তো শিক্ষার মধ্যেই পড়ে। ভারতে থাকলে এসবের সুবিধা থাকে। নিজের জনারের বাইরে অন্যান্য নাচ দেখা, এতেও চোখটা খোলে। আরও জানা যায়। কিন্তু এখানে বাচ্চাদের সেই সুবিধা নেই। মনটা ছটফট করে এই ভেবে যে এখানকার বাচ্চাগুলো অন্য স্টাইলের ভাল নাচ দেখা বা ওয়ার্কশপ করা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ নিজের ছাত্রী বলে ঢাক পিটিয়ে প্রশংসা করছিনা, তবে সাত/আট বছর পর ওদের নাচটা নাচের মত হচ্ছে টের পাই। এইসময় যদি আরেকটু কিছু শিখতে পেতো।

২০১৭তে Indian Classical Dance Troupe'য়ের প্রথম অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। বন্ধু মনিপুরী নৃত্যশিল্পী, প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শ্রী সঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকে জাপানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২০১৯য়ে আমার গুরু শ্রীমতি মমতাশঙ্কর (মমদি) কে আমন্ত্রণ জানাই। নতুন নাচ দেখা, স্টেজ শেয়ার করা এবং নাচের ওয়ার্কশপ করার সুযোগ পায় সবাই।

প্রতিষ্ঠানের ১০বছর পূর্তির দিন এগিয়ে আসছে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রিহার্সাল চলছে পুরোদমে। হঠাৎ আমরা কেউ কল্পনাতেও যা ভাবতে পারিনি, সেই কোভিডে সব ওলোটপালট হয়ে গেল। অনুষ্ঠান বন্ধ হোল। আর এই ১০বছরে প্রথম আমার টোকিও যাওয়া বন্ধ হোল। তবে ক্লাস চলেছে রীতিমত অনলাইনে। কিছু অনলাইন অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহন করেছি সবাই মিলে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। তারপর কোনওরকম কোভিডের বিপদ কাটিয়ে এই ২০২৩য়ে পৌঁছে ১০বছর পূর্তির অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছে।

এতবছর পর যেটা দেখে সব থেকে ভাললাগে, নতুন কোনও ছাত্রী ক্লাসে প্রথম এলে ছোট দিদিরা এগিয়ে আসে, আমার শেখানোর পরে তারাই তাকে এটা ওটা দেখিয়ে দেয়, শিখিয়ে দেয়। কাছে টেনে নেয়। এ আমার বড় প্রাপ্তি। পরম্পরা বোধহয় একেই বলে, শিল্প বা শিল্পী থেমে থাকেনা, বলা ভাল থেমে থাকতে পারেনা। বিদেশে থেকেও নিজের দেশের শিল্পচর্চাতে যেন খামতি না থাকে। ভারতীয় নাচ মানেই শুধু বলিউড ডান্স নয় সেটা তর্কে নয়, কাজে বুঝিয়ে দিতে হবে। নাচের প্রতি ভালবাসা শ্রদ্ধা রেখে এগিয়ে যাবো আমরা। Indian Classical Dance Troupeয়ের এই পরিবার আরও সামনে এগিয়ে যাবে এমনই তো স্বপ্ন দেখি।

আজ এতগুলো বছর এতটা পথ পেরিয়ে এসে যখন পিছনে ফিরে তাকাই সবটা কেমন রূপকথার গল্প বলে মনে হয়।

ফিরে দেখা..... রূপকথা

একটা প্রেম আর ঘুড়ির গল্প!

- সন্দীপ বসু

ঘুড়ি তো আসলে মানুষের জীবনের মতোই। আমাদের কত শত স্বপ্ন, ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা, রূপকথার রঙিন ফানুসের মতো উড়তে থাকে নীল আকাশের আনাচে কানাচে। সেই সুমন চ্যাটার্জির "পেটকাটি চাঁদিয়াল, মোমবাতি বগগা!" যেন। কখনও ঘুড়ি সুতোর বাঁধনে ওড়ে, কখনও সেই সুতো কেটে হারিয়ে যায় অন্য ঠিকানায়, কখনও আটকে যায় গাছের ডালে, টিভি এন্টেনায় বা বিদ্যুতের তারে। আর সময়ের দুই হাতে যেন ধরা থাকে উদাসীন লাটাই। নিয়তির নির্দেশে কখনও সুতো ছাড়ে, কখনও সুতো গুটোয়। এমনি করে কখন কে জানে, কাউকে কিচ্ছুটি না বলে, গোত্তা খেতে খেতে, লাট খেতে খেতে, ঘুড়ি কেটে যায়, হারিয়ে যায়! 'তার ছিঁড়ে গেছে কবে'! ভোকাট্টা!

জীবন যেন ঘুড়ির মতো, অঙ্গাঙ্গিভাবে মানুষের জীবনের প্রতীকসম। ছোটবেলায় ঘুড়ির পেছনে ইয়া লম্বা ল্যাজ লাগাবার একটা প্রচলন ছিলো। কার ঘুড়ির কত বড় সে ল্যাজ। সে এক গর্বের ব্যাপার।

এপার-ওপারের ঘেঁষাঘেষি উত্তর কোলকাতার সব ছাদ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামার আগেই চুপিসারে একটা দুটো করে ঘুড়িদের উদয় হতো আকাশের গায়ে। আর একটু পরে ওপাশের ছাদে লাল ফিতেয় দুই বিনুনি করা চুল দুলিয়ে বুলুদিও আসতো।

ঘুড়িদের কাটাকুটি খেলতে খেলতে প্রেমও আসে, আসে বিচ্ছেদও। আর আসে ঝাঁকে ঝাঁকে স্মৃতি! আসে ঠিক তেমনই করে, যেমন করে কার্তিক দা আসতো আমাদের বাড়িতে।

তখন শ্যামপুকুরের উঁচু বাড়ির ছাদ বলতে আমাদেরটাই ছিলো। ঘুড়িদের পালে হাওয়া লাগাতে এই উঁচু ছাদের চাহিদা ছিলো তুঙ্গে। মোটামুটি বৈশাখের শেষাশেষিতেই শুরু হয়ে যেত ঘুড়ির মহড়া। মোটামুটি ভাবে শেষ হতো বিশ্বকর্মা পুজোয়। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন যেন ফাইনাল ম্যাচ। কে কত ভোরে উঠবে, কে কটা কাটবে। আবার ঘুড়ি ধরারও প্রতিযোগিতা চলতো। ভোরে উঠে ঘুড়ি টানার ফ্যাচফ্যাচ শব্দে আমন্ত্রন জানানো। এসো, দেখি - "কিসমে কিতনা হ্যায় দম"। তেমনি ঘুড়ি ওড়াবার দিন এলেই কার্তিকদার আনাগোনা শুরু হয়ে যেত। বাড়িতে ঢুকেই সে হনহনিয়ে ছাদে উঠে যেত। প্রগাঢ় ভক্তি ও অশেষ উত্তেজনা নিয়ে বেড়ে ফেলতো ঘুড়ি। আর আমি ছিলাম তার একনিষ্ঠ লাটাইম্যান। আমাদের আকাশে তখন যত রাজ্যের ঘুড়িদের ঘোরাঘুরি! এ বাড়ি ও বাড়ির ছাদ থেকে কার্তিকদাকে দেখে আচ্ছা আচ্ছা ঘুড়িয়ালদের পিলে চমকে যেত। অথচ দেখতে সে গোবেচারাটি, রোগাটি, ঢ্যাঙাটি! তবে হ্যাঁ, তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গ সে, 'কার্তিক' নামে সার্থক ছিলো। সে যে কবে কোন স্কুলে কোন ক্লাস ইস্তক পড়েছে, কত যে তার ভবলীলার বয়স, কেউ তা জানতো না। পাড়ার মোড়ে বাঁকেদার চায়ের দোকানে ছিল তার ঠেক। বাঁ হাতে চায়ের গ্লাস, ডান হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। এ সব অবশ্য মোটামুটি ফ্রি, পাড়ার সবাই জানতো। কার্তিকদার কাছে পয়সা চাওয়াটা সামাজিক অপরাধ। সে খেয়ালখুশী মতো দেবে। তবে এ সবের বিনিময়ে কল সেন্টারের মতো সার্ভিস দিত সে। হাসপাতাল, থানা, শ্মশান, অনুষ্ঠানবাড়ি, বাড়িওলা-ভাড়াটে বিবাদ! ডাক পড়তো তেনার।

কার্তিকদার ঘুড়ির সে সব গল্প ক্ষুধিত পাষাণের মতো থমকে আছে স্মৃতির রাজপ্রাসাদ হয়ে।

সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে অবশ্য এ সব বাদ, কার্তিকদা ভ্যাকেশনে। ঘুড়ির সিজন তো! তেনার আসলে রক্তে ঘুড়ি। একদা ঘুড়ি ওড়ানোতে ওর বাবার ছিল শহরজোড়া যশ, ওনার নামই ছিল ঘুড়িবাবু! ঘুড়ির মাঞ্জা দেওয়ায় পেটেন্ট ছিল কার্তিকদার। হামানদিস্তায় কাঁচ গুঁড়ো করে, তাতে জল আর শিরীষের আঠা, ডিম মিশিয়ে সে এক হায়ার কেমিস্ট্রি! রাস্তার পাশের দুই সমান্তরাল বিদ্যুতের খুঁটিতে সুতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যখন মাঞ্জা দিত। কখন কোথা থেকে "লাট" নিয়ে আসতো। সে এক অদ্ভুত যন্তর। একটা লোহার শিঁকের সাথে কাঠের ফ্রেম। বনবনিয়ে ঘুরতো। আর মাঞ্জার সুতো জড়িয়ে যেতো তাতে। পাড়া-বেপাড়ার লোক সেটা দেখতে আসত। এমনকি, নিখুঁত জ্যামেতিক পরিমাপে নিজের বানানো ঘুড়ি নিজে ওড়াত কার্তিকদা। আর নিজের তৈরি নকশা দিয়ে ছুতোরকে সামনে বসিয়ে কার্তিকদা স্পেশ্যাল কিছু লাটাই বানিয়েছিল। তার কতো যত্ন, কতো তার ব্যাবহারের কায়দা কানুন। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন সে কাগুজে উড়োজাহাজের উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হিসেবে আমাদের ছাদটাই বেছে নিত? শুধুমাত্র কি সেই ঘুড়ি !!

কারণটা অবশ্যই বুলুদি। সামনের বাড়ি। এই বুলুদি আবার আমার মায়ের খুব ভালো বন্ধু ছিলো। বুলুদির বড়দার সঙ্গে আবার কার্তিকদার ঘোরতর ঘুড়ির লড়াই ছিল। তা নিজেদের বাড়ির ছাদে বড়দার ঘুড়ি ওড়ানোর বাহানায় বুলুদি রোজই ছাদে আসত। কারণ ঘুড়িটা উদ্দেশ্য নয়, তার লক্ষ্য শ্রীমান কার্তিক। বস্তুত, কার্তিকদার 'খতম অভিযান' শুরু হত বুলুদির বড়দার ঘুড়ি কেটেই। আর নিজের বড়দার সেই ঘুড়িচ্ছেদের লগ্নে, এক রোমান্টিক উল্লাসে বুলুদি চেঁচিয়ে উঠত, "ভোকাট্টা", তার নিজের দাদার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে। আমি তখন সেভেন, সবে পাকতে শুরু করেছি। বেশ বুঝতাম, কার্তিকদা আর বুলুদির মধ্যে 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'! বুলুদির গলায় ওই "ভোকাট্টা" শুনে কার্তিকের মন ঘুড়ি হয়ে উড়ে যেত এক রাজকন্যের দেশে! ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে সে গপ্পো জুড়তো, ''বুঝলি, আমার গুরু হল বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন! পাগলাটা ঘুড়িতে চাবি বেঁধে কেমন বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছিল বল!'' আমি জানতাম, আসল ঘটনাটা তা নয়! ওই মার্কিন সাহেব শুধু এটাই প্রমাণ করেছিলেন যে, বিজ্ঞানের 'বিদ্যুৎ' আর আকাশের 'বজ্রবিদ্যুৎ' এক ও অভিন্ন। কিন্তু বলব কি, তার আগেই ফের বুলুদির চিৎকার, "ভোকাট্টা!"

এ ভাবেই কার্তিকদার ঘুড়ি সব সময় তুড়ি মেরে জিততো। তবে সে বার হয়েছিল কি, 'আমাদের ছাদ'-এর কাছে পরাজিত কোনও ঘুড়িসৈনিক এক মাঝরাতের অন্ধকারে বাঁকেদার চায়ের দোকানের বাইরের দেওয়ালে রঙিন চক দিয়ে লিখে দিয়েছিল, 'কার্তিক+বুলু'! সে বেচারা বুঝতে পারেনি যে, কিছু কিছু সুতো ছিঁড়ে যাওয়া ঘুড়ি আজীবন আটকে থাকে কোনও অধরা উচ্চতায়, না ওড়ে, না ধরা দেয়! বুঝতে পারেনি হয়তো কার্তিকদাও। ঘুড়ির বাইরে ওই একটি স্বপ্নই সে দেখেছিল, সেটা ওই নীল আকাশ ছোঁয়া বুলু-ময় প্রেম! কিন্তু ঘুড়ি আর নারী তো এক নয়, প্রথমটা রোমান্স, পরেরটা রিয়েলিটি। পরের দিন সাতসকালে ওই 'কার্তিক+বুলু' আমাদের পাড়ার সমাজচিত্রটা আমূল বদলে দিয়েছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল কেচ্ছা কানাকানি। বাঁকেদা তড়িঘড়ি জল দিয়ে মুছে দিয়েছিল বটে সেই দেওয়াল লিখন, কিন্তু ততক্ষণে সেটা পাড়ায় পাড়ায় 'আকাশবাণী প্রচারিত বাংলা সংবাদ' হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে! আর ঠিক তখন, আমি নিশ্চিত, নিজ নিজ বাড়ির রুদ্ধদ্বারে বুলুদি আর কার্তিকদা একলাটি বসে মনে মনে বলেছিল, ওটা তো সত্যি। ওটা তুমি মুছলে কেন বাঁকেদা! 'হৃদয়ে লেখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে'।

কিন্তু সমাজে তো সেটা 'বদনাম'! পারিবারিক আদালতে একটি বখাটে ছেলেকে ভালবাসার অপরাধে বুলুদির বিচার হয়ে গেল। শাস্তি, বুলুদির ছাদে আসা বন্ধ, 'অনার কিলিং'। কার্তিকদাকেও আর বাঁকেদার দোকানে দেখা গেল না, এমনকি পাড়ার কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো হারিয়ে গেল ছেলেটা। পাড়ার বড়দের কাছে পরে শুনেছি, সে দিন সকালে বেপাত্তা হওয়ার আগে কার্তিকদা আমাদের বাঁকেদাকে বলে গিয়েছিল, 'ঘুড়ি ওড়ানো ছেড়ে দিলাম গো দাদা'!

এর পর, মাঘের শুরুতেই বিয়ে হয়ে গেলো বুলুদির। আমরা ছোটরা, যারা পাড়ায় কার্তিকদার চ্যালা ছিলাম, তারা কেউ যাইনি বিয়েবাড়িতে। বিয়ের পর দিন, আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম, শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার গাড়িতে ওঠার সময়, বুলুদি অপলক চেয়েছিল বাঁকেদার চায়ের দোকানের দিকে। কাউকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল ওর দুই চোখ, 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে'! কয়েক মাস বাদে, বিশ্বকর্মা পুজো যখন দোরগোড়ায়, তখন বুলুদি একটা চিঠি লিখেছিল আমার মাকে: 'সে যদি আসে এ বার তোমাদের বাড়ির ছাদে, তাকে বলো, 'ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া!'

না, সে আসেনি। বুলুদি না থাকলে সে আসবেই বা কেন!

গল্প শেষ। একটা ঘুড়ির গল্প! কিন্তু ওই যে, শরতের হাওয়ায় ভেসে যে ঘুড়িগুলো প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ায়, শুকনো ফুলের মতো গোত্তা খেতে খেতে লাট খেতে খেতে লুটিয়ে পড়ে, যে ভোকাট্টা ঘুড়িগুলো মড়া চাঁদের মতো লটকে থাকে গাছের ডালে বা বিদ্যুতের তারে, সেই ঘুড়িগুলোর প্রতিটির পিছনে এক অথবা একাধিক গল্প থাকে। অনেক দিনের পর, সে বার বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আমাদের ছাদের সিঁড়িঘরটা খুলে দেখেছিলাম, সেই সব গল্প সেথায় ক্ষুধিত পাষাণের মতো থমকে আছে স্মৃতির রাজপ্রাসাদ হয়ে। কার্তিকদার হাতে তৈরি ঘুড়িগুলোতে ধুলো জমেছে, লাটাই জুড়ে জাল বুনছে মাকড়সা। 'মুকুটটা তো পড়ে আছে, রাজাই শুধু নেই...'!

মনের আরাম

- চন্দ্রিমা কুন্ডু

কোভিড, কোভিড আর কোভিড। ঘোরা বেড়ানো সব বন্ধ। ভাইরাস এর প্রভাব, প্রতিপত্তি যখন একটু কমল দেশের মধ্যে একটু আধটু ঘোরাঘুরি শুরু হল। তাই বলে বিদেশ, পাগল নাকি!! সব দেশের কোভিড নিয়ম আলাদা। অনেক অনেক নিয়ম মেনে তবে বিদেশ যাওয়া সম্ভব। খুব প্রয়োজন ছাড়া বিদেশে কেউ পা বাড়াচ্ছে না। কাজের জন্য দেশের বাইরে থাকতে হয়, নিজের দেশে নিজের পরিবার কে দেখতে যেতে পারলেই চলবে। 2019 এর পর 2022, টানা তিন বছর পর বিদেশ ভ্রমণ, থুড়ি নিজ দেশ ভ্রমণ। যাক বাবা একটু তো ঘরের বাইরে যাওয়া গেল।

মানুষের মন একটাই কথা ভাবে, আরও চাই আরও চাই। কোভিড এর জোর আরও কমল আর মন বলল চল যাই, চল যাই। আরও কোথাও ঘুরে আসি। কাছাকাছি দেশ ভিয়েতনাম। চেনা জানা অনেক বন্ধু ঘুরে এসেছে। বেশ একটু হুড়োহুড়ি করে প্ল্যানটা করে নিলাম। কে জানে কখন আবার শুরু হয় কোভিডের আনাগোনা। নয় দিনের ট্রিপ। পুরো পরিবার বেরিয়ে পড়লাম। অনেক দিন পর অজানা অচেনা একটা দেশ দেখতে পাবার সুযোগ পেয়েছি।

হানয়, নিন বিনহ, হলঙ বে, আর হৈআন এই কয়টা জায়গা দেখার সুযোগ পেলাম সীমিত ছুটির মধ্যে। সমুদ্র ঘেরা দেশ, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। রাজধানী শহর হানয় এর ঐতিহাসিক স্থান আর প্রেক্ষাপট ছিল অতুলনীয়। উত্তর ভিয়েতনামের নদীর ধারে গড়ে ওঠা একটা ছোট্ট শহর নিন বিনহ যে কত পর্যটক আকর্ষণ করত পারে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বানা পাহাড়ের ওপর গড়ে ওঠা সান ওয়ার্ল্ড কোম্পানীর ফ্যান্টাসি পার্কের প্রযুক্তিও ছিল দেখার মতো। প্রতিদিন প্রায় দশ হাজার মানুষ চার লাইনে তৈরি রোপওয়ের সহায়তায় ঐ ফ্যান্টাসি পার্কে ওঠানামা করতে পারেন।

এতক্ষনে হয়ত সবাই ভেবে ফেলেছে ভিয়েতনামের পর্যটনের ভাল ভাল দিক তুলে ধরে সবাইকে ভিয়েতনাম ঘুরতে যেতে অনুপ্রাণিত করাই বুঝি আমার এই লেখার উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিক কালের পর্যটক ভলগ, ওয়েবপেইজ আর গুগল বাবাজির শরণাপন্ন হলে অনেক বেশি খবর পাওয়া যাবে সেই বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

হানয় শহরের একটা হোটেলে থাকার বুকিং ছাড়া আর কোন বুকিং করে যাবার সুযোগ হয়ে ওঠে নি । হানয় এর নির্ধারিত হোটেলে মিস রোজির সাথে দেখা করার কথা ছিল। দারুন হাস্যময়ী মহিলা আর কথাবার্তাও খুব সুন্দর। কত তাড়াতাড়ি কি আপন করে নিল মনে হল। আরে বাবা তাইতো হওয়া উচিত। এই সব গুণ দেখেই তো হোটেলের রিশেপসনে লোক নির্ধারন হয়। যাইহোক পুরো দায়িত্ব নিয়ে নির্ধারিত শহর গুলোর হোটেল, সাইটসিইং-এর বন্দোবস্ত, এমন কি হলঙ বে'র ক্রুজের সব বুকিং ধৈর্য ধরে সমাপ্ত করল। কাজটি করতে বেশ সময় লাগল, কিন্তু রোজীর ব্যবহারে কোন বিরক্তি নজরে পড়ল না। হয়তো এটাই তার দৈনন্দিন জীবন। যাইহোক বুকিং গুলো শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম নিকটবর্তী হোয়াং কিয়েম লেক এর উদ্দেশে। লেক এর চারপাশে প্রচুর ছোট বড় দোকান। প্রচুর পর্যটক আর স্থানীয় মানুষের আনাগোনা। দোকানদার, ফেরিওয়ালা সবার ব্যবহার বেশ ভাল। অনেকদিন পর বেড়াতে এসেছি তাই হয়তো সব কিছুই ভাল লাগছে।

পরের দিন হানয় ঘুরে দেখার জন্য যে সংস্থাতে বুকিং করেছিলাম তার প্রতিনিধি মিস্টার ডেনী নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌছে গেলেন আমাদের হোটেলে। সারাদিন ঘুরলাম তার সাথে। ঐতিহাসিক জায়গাগুলির দারুন বর্ণনা দিলেন। সবথেকে বেশি যেটা ভাল লাগলো কিছু সময়ের মধ্যেই যেন নিজের পরিবারের একজন হয়ে গেলেন। হাসি ঠাট্টা গল্প চলতে থাকল জায়গা বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে। আমার ছেলে প্রাইমারী স্কুলে পরে আর বেশ দুষ্টু। তার সাথে ডেনী এমন মজা আর খেলা করতে লাগলেন যে কিছু মুহূর্তের জন্য নিজের ভাইয়ের কথা মনে পরে গেল। মামা ভাগ্নে দেখা হলে এইরকমটাই যেন হয়।

হৈআন শহরে থাকার জন্য একটি হোম স্টেতে বুকিং করা হয়েছিল। সমুদ্রের খুব কাছে আধুনিক ডিজাইনে তৈরি বাড়ি। আশেপাশে স্থানীয় মানুষের বসতি। সব বাড়িগুলোর ডিজাইন বেশ মনে ধরার মত। নতুন গড়ে ওঠা পাড়া বলে মনে হল। কলকাতার সল্টলেকের বসতিগুলির সাথে খুব মিল পেলাম। ঐ শহরে ছিলাম তিন দিন। হোম স্টেতে থাকার সুবাদে স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবন কেমন তার একটা আভাস পাওয়া গেল। হোটেলে থাকলে সেটা থেকে বঞ্চিত হতাম। খুব সকাল থেকে আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে টিভির আওয়াজ ভেসে আসত। রোজের খবর শুনতে শুনতে সবাই কাজে বেরবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সব বাড়িতেই একটু করে বাগান ছিল। স্থানীয় লোকেরা বেশ শৌখিন মনে হয়। বাড়ির কর্তাকে দেখা যেত বাগানের পরিচর্যা করছে অথবা দুই চাকার গাড়ীর দেখাশোনা করছে। তারপর সব বেরিয়ে পড়ত রোজের কাজে। মায়েরা বাছাদের নিয়ে স্কুটারে করে স্কুলে পৌছাতে যাচ্ছে। দেখে মনে হল স্থানীয় অনেক মানুষ জীবনধারণের জন্য পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত। বিকেল বা সন্ধ্যের সময় দেখা যেত বাড়িগুলির সামনে পুরোনো দিনের দাওয়ার মতো জায়গাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মিলিত হতে। পাড়ার স্থানীয় মহিলা বা পুরুষেরা একসাথে কোন বাড়ির সামনে মিলিত হয়ে গল্প বা খেলা করছে। বাচ্চারা তো অবশ্যই। অদ্ভুত একটা ভাল লাগাতে মনটা ভরে গেল। তার সাথে ছিল একটা দীর্ঘশ্বাস, বলাই বাহুল্য। কিছু একটা না পাবার বেদনা।

হোম স্টের মালিক ছিলেন একজন মহিলা। ইংরাজিতে যোগাযোগে সক্ষম। সবকিছু দেখিয়ে দিয়ে উনি চলে গেলেন। আর আলাপ করিয়ে দিলেন বাড়ির পরিচারিকার সাথে। আমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি থেকে যাবতীয় জিনিসের বন্দোবস্তের ভার ছিল তার ওপর। স্থানীয় ভাষা ছাড়া কিছুই বলতে পারেন না। গুগল ট্রান্সলেটের মাধ্যমে চলল কথোপকথন। দুই দিনের আলাপে মন কেড়ে নিলেন পরিচারিকা মিস জুডি। সকাল সকাল একটা স্কুটারে করে পৌঁছে যেত আমাদের হোমে। আমাদের খাবার তৈরি করতে করতে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করত। একদিকে ব্রেকফাস্টের জোগাড় তো অন্যদিকে গুগল ধরে হাসিমুখে আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর। কথায় কথায় জানতে পারলাম জুডি আর হোম স্টের মহিলা মালিক সবাই কিন্তু সংসার সামলে তার সাথে সাথে নিজেদের কাজ করে চলে। সবার সময়জ্ঞান, দায়িত্ববোধ, কাজের প্রতি ভালবাসা আর সর্বোপরি মিশুকে স্বভাব দেখে একবারের জন্য হলেও ঐ দেশে জীবনের এক অংশ কাটানোর ইচ্ছা জাগিয়ে তুলল মনে।

হলঙ বে'তে ক্রুজে সমুদ্র ভ্রমণ, নিন বিনহের গ্রাম পরিদর্শন, স্থানীয় মানুষের অভূতপূর্ব শিল্পকর্ম, চিত্রকলা, সূক্ষ সূক্ষ কারুকার্যের সম্ভার নিয়ে সাজিয়ে ওঠা নাইট মার্কেট, নিত্য নতুন জায়গা দেখার মজাই আলাদা। তবে সেই আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলত সঙ্গে থাকা গাইড বন্ধুদের সুন্দর মিশুকে স্বভাব। কিছুদিন দেশটাতে ঘুরে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যা বুঝেছি তাতে সাধারণ মানুষ যে খুব কষ্টে দিনযাপন করেন তা না হলেও স্থিতিশীল রোজগার তাদের নেই। তবুও তারই মধ্যে সততার সাথে হাসিমুখে কাজ করে চলেছে সবাই। বিদেশের পর্যটকের থেকে বেশি মুনাফার ইচ্ছে বা অসৎ পথ অবলম্বনের কোন ইচ্ছেই চোখে পরে নি ঐ কয়েকদিনে। হানয় এর হোটেলে আমার ছেলে তার মোবাইল ফোন ফেলে চলে এল। রুম ছেড়ে দেবার পরেও হোটেলের কর্মচারী ছেলেটি সেটি এনে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল। ফিরে আসার দিনে আবার হানয় ফিরলাম। হানয় থেকেই আমাদের টোকিও ফিরে আসার ফ্লাইট। মিস রোজি এমন বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন যে হোটেলের সেই দিনের রুমরেন্ট না দিয়েও লাগেজকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে আমরা বাকি কিছু জায়গা দেখে এলাম।

এই দেশটার মানুষের প্রতি আমার প্রেম বোঝাতে আর কি বেশি কিছু লেখার দরকার আছে! ফিরতে হবে কাজের জায়গা টোকিওতে। আমার জন্মস্থান কলকাতার সাথে এই দেশের মানুষের একটু মিল পেলাম। তবে আজকের কলকাতার সাথে নয়। আধুনিক প্রযুক্তিতে উন্নত শহর টোকিও। বহু দেশের মানুষ আসতে চায় এই শহরে। আমি সেই সুযোগ পেয়েছি। বহুদিন হল কার্যসুত্রে এখানেই আমার বাস। নিরাপদ একটি শহর, সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি চোখের পলকে সব কাজ করে দেয়। প্রযুক্তি, সুযোগ সুবিধা কোন কিছুতেই খামতি চোখে পরে না। তবুও কেন যেন আত্মার আত্মীয় খুঁজে পাই না। সব ভাল কিছু কি আর একসাথে পাওয়া যায়। সব পেলে নষ্ট জীবন।

নারীর আবশ্যকতা

- আশা দাস

বিশ্বসৃষ্টির সকল আদর্শের সারভূতা রূপে ভগবান নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থির চিত্তে পর্যালোচনা করিলে আমরা জগৎ বন্ধন এর সমুদয় উপাদান নারী জাতের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রকৃতি বিশ্ব জগতের বন্ধন, নারীর অন্য নাম প্রকৃতি, বিশ্বপ্রসবিনী আদ্যা শক্তির অংশ রূপে তাহাদের জন্ম, সেই জন্য জগৎ স্ত্রী জাতি কে মাতৃ চক্ষে দেখে। জগতের সর্ব সন্তাপ হরণ করিতে মায়ের মতন কে আছে?

মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর হইতে, মায়ের জীবিত কাল পযন্ত আমরা অশেষ প্রকারে তাহার যত্নে রক্ষিত, পালিত ও বর্ধিত হই। কবির চক্ষে অনেক সময়ে স্ত্রী জাতিকে সৌন্দর্যের সারভূতা রূপে বর্ণিত হতে দেখা যায়, কিন্তু পুষ্পের সহিত তুলনা করিয়া কেবল তাহার মাধুর্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকাটাই কর্তব্য নহে, পুষ্প কে বিশ্ব বিটপীর বীজ রূপে উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

ক্রোড়ে কমনীয় কান্তি শিশু রমণীর যে শোভা বর্ধন করে, জগতের সমগ্র অলংকার ও সৌন্দর্য তাহার শতাংশের এক অংশ বাড়াইতে পারে কি না সন্দেহ। সংসার জীবনে নারী জাতির কর্তব্য পালনের সহিত তাহার দৈহিক সৌন্দর্যে উপযোগিতার তুলনায় শেষ উক্তিটি একান্ত অকিঞ্চিতকর বলিয়া মনে হয়ে। জন্মের প্রথম প্রভাত হইতে নারী সংসার কে মধুর স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ করে।

নারী কে কুমারী রূপে পার্বতী, যুবতী রূপে সরোঐস্যময়ী, মাতৃ রূপে জগদম্বা, প্রৌড় রূপে জগৎ পালিকা ও বৃদ্ধা রূপে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী বলা হয়।

রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্য, অভাবে, অভিযোগে - মানবের সর্ববিধ অশান্তিতে নারী একমাত্র শান্তি প্রদায়িনী।

ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভিন্ন ভিন্ন মহিমা।

মা মানে মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা। সন্তান যখন ধীরে ধীরে বড়ো হয়, হাত ধরে সব কিছু শেখায়, শরীর খারাপ হলে মাথার শিয়রে বসে থাকে। ভগবান এর কাছে প্রার্থনা করে আমার সন্তানকে ভালো করে দাও, স্কুল এ পরীক্ষা দিতে গেলে দই আর চন্দনের ফোটা দিয়ে মাথা ঠান্ডা করে যেন পরীক্ষা দিতে পারে, সন্তান যখন অফিসে যাবে তখন চিন্তা করে কি রান্না করে দেবে? এই হচ্ছে মা।

আজ এই দুর্দিনেও ভারতে তাহার বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ণ রহিয়া আছে। ভারতের নারী এখনো ধর্ম বিচ্যুত হন নাই। এখনো ভারতের নারী সর্বত্র পূজিতা, ভারতের অধিকাংশ পুরুষ এখনো নারী কে দেবী ভাবে পূজা করেন বলিয়াই তাহারা নারী জাতি কে বাসনার বশীভূত করিতে চাহেন না।

ভারতের মুনি ঋষিগণ জগৎ এর আদর্শ রূপ নর নারীর আচরণীয় যে নিয়ম শাস্ত্রে লিখে রেখেছেন তাহা একবার আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় পুরা কালে হিন্দুগণ নারী জাতি কে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। বাস্তবিক হিন্দুগণ স্ত্রী জাতি কে যে রূপ শ্রদ্ধা, সন্মান ও গৌরবের আসন দিয়েছিলেন, সেই রূপ পৃথিবীর আর কোনো দেশে এ যাবৎ দেখিতে পাওয়া যায়না। একটি নারী কে লজ্জা, বিনয়, গাম্ভীর্য, স্নেহ, দয়া, সরলতা ও সতীত্বের সৌন্দর্যে আপনাকে বিভূষিত করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তুত হইতে হয়।

এই ভারতে আবার দেখা যায় নারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা - তারই নাম প্রকৃতি মায়া, ছলনা। সকল পতন ও দুর্গতি হেতু সেই প্রকৃতি এনে দেয় ভ্রান্তি, মালিন্য, সেই ভগবানের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় দূরে।

যা অসুন্দর কে সুন্দর করে, অপূর্ণ কে পূর্ণ করে, বিচ্ছেদ কে মিলনের রাগিনীতে ভরপুর করে দেয় এবং অসামঞ্জস্যের ভিতর সুসামঞ্জস্যের সবটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারে তাকে আমরা স্ত্রী নামে অভিহিত করি।

নারী সেই স্ত্রী রূপিণী মহাশক্তি কিন্তু পারিপার্শিক আবেষ্টনের অন্যায়ের চাপে নারী আজ স্ত্রীহীন হয়ে গিয়েছে তাই ধরিত্রী মাতা দুঃখিত।

মানুষের জীবনযাত্রার আদর্শ কে নারী তাহার অন্তরের মাধুর্য দ্বারা উন্নত করিতে পারে। নারীর মহিমার দ্বারা সভ্যতার পরিমাপ হইয়া থাকে, তাহার গৃহই জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি। জীবনের মাধুর্য হলো সভ্যতা এবং সভ্যতার পরিমাপ হইলো সৌন্দর্য। এক মাত্র নারী তাহার জীবনের এই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিয়া পুরুষ দিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিতে পারে।

পারিবারিক জীবনের সমষ্টি হইলো সামাজিক জীবন, সুতরাং এই পারিবারিক জীবনের মধ্যে নিখিল মানব জাতির কল্যাণ কামনা করা নারীর অন্যতম কর্তব্য।

ইতিহাস এর পৃষ্ঠা খুললে বোঝা যায় মেবারের শত শত হাজার হাজার নারী দেখিয়ে দিয়েছেন আপৎকালীন মান মর্যাদা, তথা হিন্দু নারীর সতীত্ব রক্ষার জ্বলন্ত ত্যাগ পদ্ধতি। বিধর্মীয় ক্রূর কবল থেকে কি ভাবে নারীকে সন্মান রক্ষা করতে হয়, কি ভাবে অত্যাচারী, কর্মদক্ষ কুট কৌশল পঙ্গু করে এয়ো রক্ষা করতে হয় ভারতের নারী সেই ব্যাপারে অগ্রগামী আর তার নিদর্শন রেখে গেছেন সতী পদ্মিনী।

প্রত্যেক মানব সমাজে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত। নারী সমাজ ধীরে ধীরে আবার অস্তমিতপ্রায় পূর্ব গৌরব কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে জগতের মাঝে। গৃহে শ্রী এবং শান্তি রাখাই নারীর প্রধান কর্তব্য তাই তাহাকে গৃহ লক্ষী বলে শ্রদ্ধা করা হয়।

আজ এইখানে রাখি, ঠাকুরের চরণে জানাই অসংখ্য কোটি প্রণাম। তিনি অন্তরে থেকে সাহস জুগিয়েছেন বলেই কলম ধরা, এইসব লিখবার বা ব্যাখ্যা করবার ধৃষ্টতা, যোগ্যতা আমার এতো টুকু আছে বলে মনে করিনা।

ক্ষুদ্‌দার অবসরগ্রহণ ও হত্যাস্পৃহা

- অনুপম গুপ্ত

ক্ষুদ্‌দার চাকরি জীবন খুব বর্ণময় ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ, পরোপকারী, সদালাপী, রসিক, নির্ভিক মাঝারি র‍্যাঙ্কের কর্মকর্তা। নৈতিক আদর্শ এবং অফিসের ডিসিপ্লিনকে একশো শতাংশ মান্যতা দিতেন।

ক্ষুদ্‌দা এতই রসিক এবং জমাটি লোক যে আড্ডার যে-কোনো আসরে তিনি মধ্যমনি হয়ে যান এবং জাপান প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে তিনি "ক্ষুদ্‌দা সান" (ক্ষুদিরাম-দা স্যার বা সংক্ষেপে ক্ষুদ্‌দা স্যার)। জাপানে কেনাকাটার জায়গা, যেমন লাযোনা, সেভেন ইলেভেন, ল'সন, ফ্যামিলি মার্ট'এ গিয়ে ক্ষুদ্‌দা সান তার সীমিত জাপানি ভাষার জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে হাসিমুখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন এবং যা যা দরকার কিনেও আনতে পারেন।

এ-হেন ক্ষুদ্‌দা তার কর্মজীবনের অনেক কথা জাপানে তার নাতনি ফুচাকে বলেছিলেন। ফুচা তার বাবা-কাকা'কে জাপানের অফিসে চাকরি করতে দেখেছে। জাপানি অফিসের ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে ফুচার বেশ স্বচ্ছ ধারনা আছে। ফুচাও আজ বাদে কাল স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে কলেজের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করবে। ফুচা জানে জাপানে সব কিছুই ঘড়ির কাঁটায় চলে। ট্রেন, বাস ঘড়িকে ফলো করে, নাকি ঘড়ির কাঁটা ওদের দেখে সময় মিলিয়ে নেয়, বলা মুশ্‌কিল। কোলকাতায় কিন্তু সবাই স্বাধীন, ঘড়ির কাঁটার কাছে কেউ পরাধীন নয়। কোলকাতায় অফিসে যে-কোনো সময় ঢোকা বা বেরোনোর স্বাধীনতা সব কর্মীর আছে। এখানকার ট্রেন-লেট নিয়ে একটা গল্প চালু আছে। আসানসোল স্টেশনে একটা ট্রেন ঢোকার সময় একজন যাত্রী টিকিট পরীক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ট্রেনটা আজকের ট্রেন তাড়াতাড়ি এসেছে, নাকি গতকালের লেট করা ট্রেন"?

যাইহোক, কথা হচ্ছিল ক্ষুদ্‌দা'কে নিয়ে। ফুচা শুনেছে ক্ষুদ্‌দা, মানে তার ঠাকুরদার সেইসব রঙীন দিনগুলোর কথা, যখন লেখাপড়া শেষ করে এক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সুযোগ পান। বকুল বাগান রোডের অন্যান্য জ্যাঠা, কাকা, দাদাদের মতো এই যুবককেও প্রতিদিন মাছের ঝোল ভাত খেয়ে অফিসে যেতে হবে! ফুচা অবশ্য জাপানে তার বাবা, কাকা'কে ভাত খেয়ে অফিসে যেতে দেখেনি। কিন্তু ক্ষুদ্‌দার মনের আনন্দ যেন আর ধরে না। মনের আনন্দে বেসুরো গলায় নিজেই গেয়ে ওঠেন ---

গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর ---
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর?

মনে এত পুলক যে তার মনে হয় তার মতো কর্মবীর আর কোথাও নেই। অফিসের, শহরের বা রাজ্যের সব অবিচার এক হাতেই সামলাতে পারবে ---

রামু হও, দামু হও, ও পাড়ার ঘোষ বোস --
যেই হও এই বারে থেমে যাবে ফোঁস ফোঁস।
খাটবে না জারি জুরি, আঁটবে না মারপ্যাঁচ
যারে পাব ঘাড়ে ধরে কেটে দেব ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ।

রসিক ক্ষুদ্‌দার অন্তরের রসের ভাণ্ডার সবসময়ই ফুটছে। অফিসে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে মনে হয় রাস্তার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলে ব্যস্ত হাঁড়িমুখো সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করে ---

তেজপাতে তেজ কেন? ঝাঁজ কেন লঙ্কায়
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায়?

অফিসের কাজের চাপকে মাঝে মাঝে লঘু করার জন্য সহকর্মীদের প্রশ্ন করেন ---

পেট কেন কামড়ায় বল দেখি পার কে?
বল দেখি ঝাঁজ কেন জোয়ানের আরকে?

আর এই জন্যই অফিসে ক্ষুদিরাম চাকলাদার --- মিস্টার চাকলাদার, ক্ষুদিরাম বাবু থেকে হয়েছেন সকলের প্রিয় ক্ষুদ্‌দা, কিম্বা জাপানে ক্ষুদ্‌দা সান।

কিন্তু এই নয়নের মণিকেও অফিস থেকে অবসর গ্রহণ করতে হবে এবং শেষের সেই দিন আসন্ন। ক্ষুদিরাম চাকলাদারের চুক্তিবদ্ধ চাকরি জীবনের সমাপ্তি সঙ্ঘটিত হবে। পরের দিন থেকে মুক্ত ক্ষুদিরাম চাকলাদারের জীবনে শুরু হবে নতুন ইনিংসের খেলা।

রমলা বৌদির কাছ থেকে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা আমরা শুনেছি। ফুচা আজ শুনছে। কিছুদিন ধরে এই রসিক, অজাতশত্রু, পরোপকারী ক্ষুদ্‌দার কারোর ওপর প্রচণ্ড রাগের বহিপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে। বৌদি দেখছেন অবসর গ্রহণের দিন যত এগিয়ে আসছে ক্ষুদ্‌দার উষ্মা ততই প্রকট হচ্ছে। বৌদি চিন্তিত, কারণ তিনি তার স্বামীকে কোনোদিনও রাগতে দেখেননি। পান থেকে চুন খসলে রমলা বৌদিকে রাগতে দেখা গেছে, কিন্তু ক্ষুদ্‌দার শরীরে রাগ, ক্ষোভ, উষ্মা কিচ্ছু নেই। এহেন ক্ষুদ্‌দা বৌদিকে জানিয়ে দিয়েছেন অবসর গ্রহণের প্রথম দিনে খুন করবেন। কি সাঙ্ঘাতিক! কিন্তু কেন খুন করবেন? খুনের দিন স্থির থাকলেও কাকে এবং কেনই বা খুন করা হবে ক্ষুদ্‌দা জানাচ্ছেন না। ক্ষুদ্‌দা'র এই হত্যার স্পৃহার কথা রমলা বৌদি আগে কখনই শোনেননি। রিটায়ার করার দিন যত এগিয়ে আসছে, স্বামীকে যেন এক অচেনা ভয়াবহ খুনি বলে মনে হচ্ছে রমলা বৌদির। ক্ষুদ্‌দা বলছেন তিনি তার চরম শত্রুকে খুন করবেনই। আর মাত্র তিরিশ দিন, আর মাত্র ঊনত্রিশ দিন --- এইভাবে আটাশ, সাতাশ করে সেই ভয়াবহ দিনটি এগিয়ে আসছে। রমলা চাকলাদার বিয়ের পর থেকে তার শ্বশুরবাড়িতে কারোর হত্যাস্পৃহা আছে বলে শোনেননি।

কী দিয়ে খুন করবেন সেই সব অস্ত্রও জোগাড় করে রাখছেন। বৌদি কি লোকাল থানায় অগ্রিম ডায়রি করে রাখবেন? কিন্তু নিজের স্বামীর নামে অগ্রিম ডায়রি? সেটা কি সম্ভব? আহিড়ী টোলায় বৌদির বাপের বাড়িতে জানানো যেতে পারে, কিন্তু বৌদির ভাইয়েরা বলবে, তখন তোমার বাবা কাকারা মত দেননি। এখন ঠ্যালা বোঝো"!

বৌদি ক্ষুদ্‌দা'কে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, ওকে খুন না করে কোথাও নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। দাদা মেঘ-গর্জন সদৃশ কঠিন কণ্ঠে স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, রাজা অয়দিপস'কেও তো নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল, লাভ হয়েছিল কি? এছাড়াও বলা হোল খুন করার মানসিক শক্তিকে দুর্বল করার যাবতীয় ছলচাতুরী হবে অমার্জনীয় অপরাধ।

ক্ষুদ্‌দা তার আটত্রিশ বছর ওই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার পরে অবসর নিয়ে বাড়িতে এসে জানালেন অপরাধীর বিচারে বিচারকের শেষ-বিচার আগামীকাল। আগামী কাল নতুন মাসের প্রথম দিনের প্রত্যুষে এক মাহেন্দ্রক্ষণে অপরাধীকে হত্যা করে মরদেহ সৎকার করতে হবে। অপরাধী ক্ষুদ্‌দাকে তিল তিল করে মেরেছে। সুখের সময় যে তাকে নির্দয়ভাবে স্লো-পয়জনিং করেছে, তাকে কি মেরে ফেলা উচিত নয়?

ক্ষুদ্‌দা বৌদিকে বললেন, যাকে কাল প্রত্যুষে খুন করা হবে, সে বৌদির খুবই প্রিয়, 'ফেবার লুভা' কোম্পানির এ্যালার্ম ঘড়ি, যে ক্ষুদ্‌দাকে সকাল ছ'টায় বিছানা থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুলে দিত। শীতকালে বা বর্ষাকালে অঝোরে বারিধারা বর্ষণের সকালে ঘুমানোর স্বর্গীয় সুখকে যে তিল তিল করে মেরেছে, তাকে কি খুন করা উচিত নয়? কা ল থেকে ওই ঘড়ির কর্কশ কণ্ঠের চিৎকারের আর প্রয়োজন হবে না।

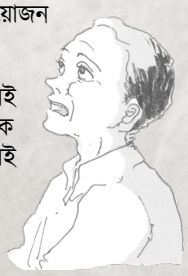

ফুচা বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেই ফেললো, যাক্ বাবা তুমি তাহলে সত্যি সত্যিই কাউকে খুন করনি। আর তোমার মতো লোক খুন করবেই বা কি করে?

অনুভূতি

- পর্ণা চক্রবর্তী (ভট্টাচার্জী)

-" মামনি পাশের বাড়ির কাকিমা এসেছেন, তোর পুজোর জামা দেখতে, দেখা.. "

মামনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে পুজোর জামা দেখাতে লাগলো। কে কোনটা দিয়েছে সেটা পর্যন্ত বলতে লাগলো কাকিমাকে। কাকিমাও উৎসাহভরে জামা গুলো দেখছিলেন।

ছোট্ট মামনির বয়স তখন ৭ কি ৮ বছর। সে কিছুই জানে না.. শুধু জানে নতুন জামা কাপড় পরে পুজোর সময় বাবা মায়ের হাত ধরে বেরোতে হয়, আনন্দ করতে হয়, খেতে হয়, কটা ঠাকুর দেখল গুনতে হয়..।

সেবার মামনির ছোট মাসি ওকে একটা লাল ফ্রক দিয়েছিলেন, যেটা মামনির ভীষণ পছন্দের ছিল। ও মা কে বলে রেখেছিল সপ্তমীর দিন বিকেলে ও সেই লাল ফ্রকটা পরে বেরোবে। অষ্টমীতে তো মা বাবার দেওয়া জামা পরতে হয় আর নবমী, অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই ও সপ্তমীতেই পরবে। সপ্তমীর দিন সকাল থেকে মামনি ভীষণ উৎসাহিত আজ সেই পছন্দের লাল ফ্রকটা পরবে। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হতে না হতেই মামনি ভীষণ অধৈর্য হয়ে পড়ে । মা ওকে সুন্দর করে সাজিয়ে লাল ফ্রকটা পরিয়ে দিল। মামনি বাবা মার সাথে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে লক্ষ্য করে একটি মেয়ে রাস্তার ধারে ছেঁড়া জামা পরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মামনি কিছু না বুঝে এগিয়ে গেল। অষ্টমী ও নবমীতে ও আর সেই মেয়েটিকে দেখতে পেলো না কারন ওরা অন্যদিকে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল।

কিছু বছর পর বাবার সাথে নানান গল্প করতে গিয়ে হঠাৎই ওর সেই ছোটবেলার লাল ফ্রক ও সেই দিনের বাচ্চা মেয়েটির চোখ দুটোর কথা মনে পড়ে। কথা বলতে গিয়ে নিজের অজান্তেই ওর গলাটা কেমন ভারী হয়ে উঠে। ও ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করে..

- " বাবা এমনটা হল কেন.. আমার সেই দিনের কথা চিন্তা করে মনটা খারাপ লাগছে কেন বলতো..।'

বাবা মেয়ে কে বোঝালেন...

-" মা তখন তুমি ছোট ছিলে তাই বুঝতে পারোনি, সেই মেয়েটির চোখদুটো তোমাকে এটাই বলতে চেয়েছিল যে পুজোটা শুধু কিছু মানুষের নয়, পুজো সবার, সব শ্রেণীর মানুষের। সেই দিন তোমার পরনে নতুন লাল জামাটা দেখে হয়তো ওই মেয়েটি নিজের কপালকে দোষ দিচ্ছিল।"

মামনির অবচেতন মনে এই কথা গুলো ঘর বেঁধে ছিল । রাতেই স্বপ্নে দেখে সেই মেয়েটির ওর দিকে তাকিয়ে থাকা চোখদুটো .....আজ মেয়েটিও বড় হয়েছে মামনির মতো। কোথায় আছে কেমন আছে কে জানে। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে মামনি ওর বাবাকে আগের রাতের স্বপ্নের কথাটা বলল, বাবা বললেন .....

-" মা তাই জন্যই তো আমরা মানুষ। আমাদের লোকের কষ্ট দেখে কষ্ট হয়। একটা কথা মনে রাখবে... তুমি যতই নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও না কেন, পা টা সব সময় মাটিতে রাখবে। যেদিন তোমার পা অহংকারের দিকে উঠবে, সেদিন তোমার জীবনের আর কোন মূল্য থাকবে না... তুমি আর মানুষ রইলে না..।"

সেই দিন বাবার কথাটা শুনে ও নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞা করলো, যে কোনদিনই কোন মানুষকে অবহেলা করবে না, বরং তাদের কষ্টের সমব্যথী হবে।

বছর গড়িয়ে আজ মামনি মধ্য বয়স্কা প্রতিষ্ঠিতা মহিলা। আজ ও সে মাঝেমাঝে সেই চোখ দুটো খোঁজে, আর বাবার কথা মতো পা মাটিতে রেখেই জীবন যাপন করে...।

সত্যি..... ! মানুষ নিজেরটা ছাড়া আর কারুর জন্য চিন্তা করে না। নিজের পরিবার, নিজের সন্তান, নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়... কিন্তু যখন সে পৃথিবী ছাড়ে .. খালি হাতেই যায়.. কিছুই নিয়ে যায় না। তাহলে কেন মানুষের এত বিভাগ - উচ্চ শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা এই ভেদাভেদ করেন না তাহলে কি মেনে নিতে হবে যে কর্মফলই মানুষের ভেদ সৃষ্টি করে.....।।

ম্যাজিক সফর - জাপান

- সৌরিশ সরকার

জাপানের কারাওকে বারগুলো খুব অদ্ভুত জায়গা। একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকিয়ে দেবে - মেনুকার্ডের মতন দেখে শুনে একটা গান পছন্দ করে চালিয়ে দিতে হবে - টিভি স্ক্রিনে গানের কথাগুলো আসতে থাকবে, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চলতে থাকবে, আর আপনি তারস্বরে গেয়ে যাবেন। ঘরগুলোর সাউন্ড প্রুফিং জাপানি টেকনোলজি - অন্য সব জাপানি জিনিসেরই মতন - একদম পারফেক্ট। কোনো আওয়াজ বাইরে যাবে না।

বছর আষ্টেক আগে ওয়ামা থেকে এক সন্ধ্যেবেলা ট্রেনে করে টোকিও ফেরার পথে এক অল্পবয়েসী জাপানি কলিগ - শুনশুকে - বললো চলো দেখবে কেমন লাগে। আমি তো এক পায়ে খাড়া - হিন্দু স্কুলে বারো বছর শারদোৎসব দেখেছি - এক বারও স্টেজে উঠতে দেয়নি ছন্দক সুমন্তরা। নাহয় গাইতে পারি না, তাই বলে ওরকম করবে? চার বছর শিবপুরেও তথৈবচ। শিবপুরে প্রথম দিন সন্ধ্যেবেলা এক দল সিনিয়র হোস্টেলে এলো জিজ্ঞেস করতে কারা গান বাজনা করতে পারে - তাদের দু সপ্তাহ রিহার্সাল করিয়ে নাকি ফ্রেশার্স ওয়েলকাম হবে। ঘন্টা তিনেক হোস্টেলের বাইরে থাকা যাবে র‍্যাগিং এর মধ্যগগনে - কাজেই তাদের পেছন পেছন চলে গেলাম রিহার্সালের জায়গায়। এস্প্লানেডের ফুটপাথ থেকে কুড়ি টাকা দিয়ে কেনা এক পিস মাউথ অর্গান ছিল আমার - সেইটায় বাজিয়ে দিলাম বাঙালির দুই স্টেপল – "পুরানো সেই দিনের কথা" আর "বড়ো আশা করে"। এতো ভালো হয়েছিল যে শেষ করার পর কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি অনেকক্ষণ- শেষে এক সিনিয়র ছলছল চোখে বললো আমি যেন আর না আসি, সন্ধেবেলাটা যেন হোস্টেলেই রেওয়াজ করি।

সেদিন টোকিও স্টেশনে শুনশুকে ছাড়া আর একজন ছিল - লুইজ, আমারই বয়েসি, সাও পাওলোর ছেলে - আমার সাথে জাপান গেছিলো, ওর কোম্পানি আমাদের কোম্পানির ইঞ্জিন পার্টস সাপ্লাই এর কাজ করে দিতো জয়েন্ট ভেনচার ইঞ্জিন প্ল্যান্টে। তিন জনে ঢুকলাম কারাওকে বারে - খাবার দাবার জল ইত্যাদি অর্ডার করে ছোট্ট ঘরে ঢুকে গানের মেনু দেখে দেখে শুনশুকে আমাদের গান শোনালো আধ ঘন্টা ধরে - বুঝলাম কারাওকে ব্যাপারটা কি। আরো বুঝলাম শুনশুকে কেন বাড়িতে বৌকে গান না শুনিয়ে আমাদের শোনাতে নিয়ে এসেছে। এক রাউন্ড খানাপিনার পর আমার টার্ন এলো - আমি সেই খাতা খুলে রবীন্দ্রসংগীত কিছু যখন খুঁজে পেলাম না - গানস এন্ড রোজেসের 'টেক মি ডাউন টু দি প্যারাডাইস সিটি' টা মনে মনে কয়েক হাজার বার গেয়েছি - নামিয়ে দিলাম ওটাই বেশ দরদ দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম কেমন হলো? শুনশুকে দেখলাম কোমায় চলে গেছে; আর লুইজ বললো আমার কোম্পানির কন্ট্রাক্টটা রিনিউ করার টাইম আসছে, কাজেই দুর্দান্ত হয়েছে গান। তুমি কি আরো গাইবে? আমিও ছাড়ি নি - এক মাঘে শীত যায় না ভাই - লাস্ট আট বছর ধরে মাঝে মাঝেই ফোন করে জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ রে, ২০১৪ ওয়ার্ল্ড কাপের সেমিফাইনাল খেলাটা শেষ হলো? নাকি জার্মানি এখনো গোল দিয়েই যাচ্ছে?

রাত দুটো'র সময় সেই কারাওকে বার থেকে বেরিয়ে সাবওয়ে ধরলাম আমি আর লুইজ হোটেল ফিরবো বলে। শুনশুকে বাড়ি চলে যাবার আগে ট্যাক্সি ধরে দিতে চেয়েছিলো - কিন্তু আমি বললাম আরে না না, আমি অলমোস্ট লোকাল - টোকিওর সাবওয়ে রুট আমার হাতের তালুর মতন চিনি। আসলে চিনতাম শুধু একটা স্পেসিফিক রাস্তা - গন্তব্য স্টেশনে নেমে বেরোবার গেটটা দেখি বন্ধ করে দিয়েছে রাত্রি হয়েছে বলে - ব্যাস, অন্য আর একটা গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়েই দেখলাম সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছি! শুনশান টোকিওর রাস্তা - আমাদের হোটেলের চিহ্নমাত্র নেই - সাথে শুধু অপদার্থ লুইজ - মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করছে আমার টোকিও চেনাটা কি আমার গান গাওয়ারই মতন? এই প্রচন্ড বেগতিকের সময় হঠাৎ দেখি দুজন সাইকেল করে যাচ্ছে। কাছে আসতে দেখলাম অল্পবয়েসী স্বামী স্ত্রী - রাত দুটোর সময় ফাঁকা রাস্তায় মুশকো দুটো বিদেশী লোকের কাছে যাদের দাঁড়াবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমাদের প্রচন্ড অবাক করে দিয়ে ওরা দাঁড়ালো। আর ছেলেটা পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো আমরা হারিয়ে গেছি কিনা। আমি বুঝিয়ে বললাম টোকিও আমার একদম চেনা জায়গা, তবে একটু টোকিও বে'র ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলটা কোন দিকে দেখিয়ে দিলে খারাপ হয় না। ছেলেটা খানিকক্ষণ হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো - তারপর ফোন বার করে বললো ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি, তোমার হোটেল থেকে ৫ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছো। ট্যাক্সি আসার পর ছেলেটা ড্রাইভারকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলো কোথায় যেতে হবে - তারপর দুজনে মিলে অনেক বাও টাও করে চলে গেলো। কলকাতা শহরে রাত দুটো র সময় আমরা কোনো জাপানিকে দাঁড়িয়ে ডিরেকশন দেব কি? কে জানে। লুইজ বললো সাও পাওলোতে কেউ দাঁড়াবে না - তবে সাও পাওলোতে কেউ আমার মতন গানও গাইবে না। এরপরও সেমিফাইনালের স্কোর জিজ্ঞেস না করে থাকা যায়?

বলার মতো গল্প

- বিশ্বনাথ পাল

গল্প আমাদের সবারই কিছু না কিছু থাকে
ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়ানোর গল্প
বা মাছ ধরার গল্প,
স্কুল কলেজের অনেক গল্প
কিম্বা প্রথম প্রেমের গল্প,
কিন্তু বলার মতো গল্প সবার থাকে না।

ইচ্ছে আমাদের অনেক আছে
হিমালয়ের পাহাড় চড়ার ইচ্ছে বা সাগর পাড়ির ইচ্ছে,
পাখির মতো আকাশে ওড়ার ইচ্ছে
কিম্বা আমাজনের অরন্যে অভিযানের ইচ্ছে,
কিন্তু মাদার টেরিজার মতো আর্তের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা
না..., তেমন ইচ্ছে সবার থাকে না।

স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি
দামী বাড়ী-গাড়ীর স্বপ্ন
বিলাস বহুল সুখী সংসারের স্বপ্ন,
রামধনুর মতো রঙ্গিন জীবনের স্বপ্ন
এমনি আত্মকেন্দ্রিক হাজারো স্বপ্ন,
কিন্তু নেতাজীর মতো স্বাধীনতার স্বপ্ন
ভয়হীন মুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন ...সবার থাকেনা।

আর এমনি বিচিত্র ইচ্ছে স্বপ্ন যাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়
অনিশ্চিত পথে পা রাখার অদম্য সাহস যাদের,
বজ্রকঠিন প্রত্যয় যাদের মনে
এভারেস্টের শিখর ছোঁয়া পর্যন্ত যারা থামতে জানেনা,
মানবের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে যায় মহামানব...,
তাদেরই গল্প হয়ে ওঠে বলার মতো গল্প ।।

জ্যোৎস্না রাতের ন্যাকামি

(Dylan Thomas এর Clown in the Moon অবলম্বনে)

- কৌশিক ভট্টাচার্য্য

এক অজানা হিমশীতল আকাশ
আমার জন্য একরাশ দুঃখ নিয়ে আসে
আর আমার কান্না ঝরে পড়ে নিঃশব্দে
গোলাপের পাপড়ির মত।

মাটি ছুঁতে বড় ভয় হয়
যদি ভেঙে যায়, যদি ভেঙে যায় ওরা।
উদাস আর সুন্দর কোনো
স্বপ্ন যেন ওরা।
ভাঙতে বড় ভয় হয়,
বড় ভয় হয় আমার।

স্বাধীনতা

- শান্তনু চক্রবর্তী

ভোরের খোঁজে কোমর বেঁধে নেমেছে দেশবাসী
তিন কুড়ি দশ পেরিয়ে আরো ছয় বৎসর বাসি
স্বাধীনতা'র বিষম ভারে চোখে আঁধার দেখি
স্বাধীন হয়ে কি যে পেলাম, তারই হিসেব লিখি ।

স্বাধীনতার খুঁজতে মানে, প্রচুর গবেষণা
ধর্ম, জাতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আনাগোনা
"আমরা ভালো, ওরা খারাপ", এটাই মোদ্দা কথা
"আমার পথই উৎকৃষ্ট", মতান্তরে ব্যাথা।

পাঠ্যবই পাল্টে দেওয়া, বর্তমানের কৃষ্টি
"ছাপ ফেলার" প্রচেষ্টাতে হউক নবীন সৃষ্টি
ঠিক ভুলের হিসাব নিকাশ, শাসক কুক্ষিগত
ইতিহাস কে পাল্টে দেওয়া, তাহাই হউক ব্রত।

গুণীজনের গুনে তে ঘুন, তাই তাহারা ব্রাত্য
প্রাচ্য জয়গানে বরং নিপাত যাক পাশ্চাত্য
এই জগতে যাহাই ভালো, মোদের আবিষ্কার
তাহার অন্যথা হলেই করো বহিস্কার ।

এমন আবহেতে জীবন করে যে হাঁসফাঁস
চিন্তাশীল নাগরিকের ওঠে নাভিশ্বাস
এ কেমন স্বাধীনতা, এ কেমন প্রগতি
স্বাধীন চিন্তাধারায় যেন পড়ছে আজি যতি।

সাতাত্তুরে স্বাধীনতায় বাহাত্তুরের ছাপ
নুতন রূপে স্বাধীনতা বুঝতে শেখার চাপ
ঋষি মনীষী'র নাম আউড়ে, আচরি বিধর্ম
বেআইনি কাজকর্মে সরকার দেয় বর্ম ।

বর্তমানের প্রয়োজন নুতন দৃষ্টিভঙ্গি
চিন্তা ভাবনা করা'র যেথায় পাবো মোরা সঙ্গী
চিন্তা করার স্বাধীনতা'র বড়ই প্রয়োজন
সংবিধান কে রক্ষা করা'র হোক না আয়োজন।

মানব ধর্ম করি আপন, আরাধি ঈশ্বরে
বাহ্যিক ভেক ত্যাজি, তাকাই অভ্যন্তরে
অন্তরের পবিত্র দীপ যবে উঠবে জ্বলি
পূর্ণ স্বাধীনতা'র পায়ে দেব শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মা

- পূর্ণিমা ঘোষ

মায়ের মাঝে বিশ্ব বিরাজে, আমার চোখে মা ভাসে
সব কষ্টের সাহারা মা, সব বিপদে মা পাশে।
আমার পীড়ায় চিন্তায় মা,অনিদ্রায় কাটায় রাত
আমার যত্ন আমার সাজ, সবকিছুতে মায়ের হাত।

খাবার পাত্র দেয় সাজিয়ে, আমার খিদে মা বোঝে
মায়ের বুকে মাথা রেখে, আমি পাই শান্তি খুঁজে।
ভাষা ছাড়াই আমার ভাষায় মা'র হৃদে কী সুর ওঠে
আমার সুখে আনন্দেতে মা'র মুখে হাসি ফোটে।

মা'র আশীষ ঘিরে থাকে আমায় বুঝি সারাক্ষণ
আমার কাছে মা'র স্নেহ, অমৃত সম অমূল্য ধন।
এ বিশ্বে মা-ই মহান, মাকে পূজে সর্বজন,
মায়ের পূজায় মাকে দেখি, মাকে স্মরি সারাক্ষণ।

বিসর্জন

- সুব্রত বণিক

দুগ্গা আমার মৃন্ময়ী মা
আর এক মা চিন্ময়ী,
গর্ভধারিণী সেই মা যে আমার
পরম মমতাময়ী।
মৃন্ময়ী মা দুগ্গা আমার
বছর বছর আসে,
চিন্ময়ী মা গেছে চলে
আর আসে না মোর পাশে।
মৃন্ময়ীর আগমনে শরৎ
মিঠেল রোদে হাসে,
ধরিত্রীর বুক ওঠে ভরে
ঝরা শিউলি আর কাশে।
চিন্ময়ী মা আর আসে না
সাত শরৎ হ'ল পার,
আদর করে আর কেউ ডাকে না --
তাঁর পাইনে দেখা আর।
মৃন্ময়ী আজ কৈলাস যাবে ফিরে
নদী কূলে ঢাকের গর্জন,
সাত শরৎ আগে চিন্ময়ী গেছে ফিরে,
গঙ্গায় তাঁরে দিয়েছি "বিসর্জন"।